বাংলাপিডিএফ

৭৩-৭৪ দুই খণ্ড একত্রে

# অট্টহাসি

## রোমেনা আফাজ

দস্যু রানীর কবলে দস্যু বনহুর

রুনি

দস্যু বনহুর সিরিজ
দুই খণ্ড একত্রে

# অট্টহাসি-৭৩
# দস্যু রাণীর কবলে দস্যু বনহুর-৭৪

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
**মোঃ মোকসেদ আলী**
**সালমা বুক ডিপো**
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ জুলাই ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
**বাদল ব্রাদার্স**
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
**বিশ্বাস কম্পিউটার্স**
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
**সালমা আর্ট প্রেস**
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

**দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র**

## উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

**রোমেনা আফাজ**
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

# দস্যু বনহুর

❑

জ্যোতির্ময় চমকে উঠলো।

দিপালী বললো—ভয় নেই রাজকুমার, সেই হতভাগ্যটিকে নির্যাতন করা হচ্ছে।

উঃ, কি পিশাচ তোমরা!

হাঁ রাজকুমার, আমরা পিচাশই বটে। দিনের পর দিন আমরা নিরীহ মানুষের বুকের রক্ত নিংড়ে নেই। এমনি করে কত জীবন যে আমাদের এখানে নিঃশেষ হয়ে গেছে.....একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে দিপালী।

জ্যোতির্ময় কোনো উত্তর না দিয়ে এগুতে থাকে।

সুড়ঙ্গপথে এগুচ্ছিলো ওরা।

সুড়ঙ্গপথে তেমন কোনো আলো ছিলো না। আধো অন্ধকারে অতি সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছিলো জ্যোতির্ময় আর দিপালী।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি পরিলক্ষিত হলো।

থমকে দাঁড়িয়ে ছায়ামূর্তি পরিলক্ষিত হলো।

জ্যোতির্ময় কিছু বলতে যাচ্ছিলো, দিপালী ওর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে অপর হাতের একটি অংগুলি ঠোঁটে চাপা দিয়ে বললো—চুপ!

দিপালীর থেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ময় নিজেও থেমে পড়েছিলো!

ছায়ামূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই বললো দিপালী—আর একটু হলেই সর্বনাশ হতো।

অবাক কণ্ঠে বললো জ্যোতির্ময়—কেন?

দিপালী চাপাকণ্ঠে বললো—বাবা ঐদিকে গেলো। একটু থেমে বললো সে—চলুন রাজকুমার, ফিরে যাই।

জ্যোতির্ময় বললো—না, এতোদূর এসে ফিরে যেতে আমি চাই না দিপালী।

কিন্তু.....

কোনো কিন্তু নেই, চলো।

বাবা আছে সেখানে.....

থাকলোই বা.....

এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে একটা তীব্র আর্তনাদ। অতি যন্ত্রণাদায়ক মর্মস্পর্শী করুণ কণ্ঠস্বর। সমস্ত সুড়ঙ্গপথ যেন সে আর্তনাদের শব্দে শিউরে উঠছে।

দিপালী বললো—ও দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারবো না রাজকুমার। আপনি যান, আমি এখানে অপেক্ষা করছি। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন দেখে না ফেলে।

জ্যোতির্ময় বললো—আমি নিজে সতর্ক এবং সাবধান আছি দিপালী, তুমি আমার জন্য কিচ্ছু ভেবো না।

এগুলো জ্যোতির্ময়।

দিপালী দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

আর সামান্য পথ এগুলেই সুড়ঙ্গপথ শেষ হবে এবং একটি আধো অন্ধকার কক্ষ দেখা যাবে। সেখানেই রাখা হয়েছে সেই বন্দী লোকটিকে। হাত-পা লৌহশিকলে আবদ্ধ, সমস্ত শরীরে কষাঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। স্থানে স্থানে কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে।

জ্যোতির্ময় আড়ালে এসে দাঁড়ালো। সম্মুখে দৃষ্টি পড়তেই শিউরে উঠলো সে, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো রাজকুমার।

কখন যে দিপালী তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো বুঝতে পারেনি জ্যোতির্ময়। দিপালী জ্যোতির্ময়ের কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে উঠলো জ্যোতির্ময়, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—তুমি।

হাঁ, এলাম।

কি নির্মম দৃশ্য!

ঠিক ঐ মুহূর্তে দু'জন লোক একটি লৌহকড়াই ধরে নিয়ে এলো। লৌহকড়াইর মধ্যে গনগনে আগুন জ্বলছে। আগুনে গোঁজা রয়েছে দুটো লৌহ সাঁড়াশি।

দিপালী আর জ্যোতির্ময় বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। ওদের দু'চোখে ফুটে উঠেছে একটা ভীতিকর ভাব।

জ্যোতির্ময় কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

দিপালী ওর মুখে হাতচাপা দিলো।

সেখানে আরও তিনজন এসে দাঁড়িয়েছে। দিপালী আর জ্যোতির্ময় তাকিয়ে দেখলো, তাদের মধ্যে রয়েছে কান্তা বারের দু'জন লোক আর দিপালীর বাবা হিম্মৎ খাঁ।

হিম্মৎ খাঁ আদেশ দিলো—ওকে চিরদিনের মত অন্ধ করে দাও।

অমনি দু'জন লোক যারা লৌহকড়াই বহন করে আনলো তারা অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দুটো তুলে নিলো হাতে, তারপর ভয়ঙ্কর একটা শব্দ করে এগুতে লাগলো বন্দীর দিকে।

ঐ সময় হঠাৎ জ্যোতির্ময় দিপালীকে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো এবং মুহূর্তে প্যান্টের পকেট থেকে একটি রিভলভার বের করে চেপে ধরলো হিম্মৎ খাঁর বুকে।

হিম্মৎ খাঁ কিছু বঝবার পূর্বেই জ্যোতির্ময়ের রিভলবার তার বুক থেকে সরে গর্জে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে লুটিয়ে পড়লো একজন লৌহশলাকাধারী শয়তান। পরমুহূর্তে দ্বিতীয় ব্যক্তিও লুটিয়ে পড়লো।

হিম্মৎ খাঁ এমন একটা অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। সে উপস্থিত কোনো একটা অস্ত্রের সন্ধানে তাকালো এদিক ওদিক।

হিম্মৎ খাঁর সঙ্গীদ্বয়ও পালাতে যাচ্ছিলো কিন্তু পালাবার সময় পেলো না তারা। জ্যোতির্ময়ের রিভলভারের গুলী তাদের হৃৎপিন্ড বিদীর্ণ করলো।

দিপালীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। রাজকুমার জ্যোতির্ময়কে সে একজন নিরীহ লোক মনে করেছিলো, কিন্তু এ মুহূর্তে তার রুদ্রমূর্তি দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

হিম্মৎ খাঁও কম অবাক হয়নি, সে জ্যোতির্ময়কে কান্তা রারের একজন বড়রকমের খদ্দের মনে করে এসেছে এতোদিন। জ্যোতির্ময় আসার পর থেকে তার কান্তা বারের উপার্জন বেড়ে গেছে দ্বিগুণভাবে, কাজেই ওকে হিম্মৎ খাঁ সব সময় সমীহ করে এসেছে একান্তভাবে। আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে সেই খদ্দেরকে অদ্ভুত এক মূর্তিতে দেখে হতবাক হবার কথাই বটে।

কিন্তু বেশিক্ষণ সময় লাগলো না হিম্মৎ খাঁর সামলে উঠতে। সে আক্রমণ করলো ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত জ্যোতির্ময়কে। কিন্তু জ্যোতির্ময় ক্ষিপ্রগতিতে একপাশে সরে গিয়ে হিম্মৎ খাঁর বুক লক্ষ্য করে রিভলবার

উঁচিয়ে ধরলো—সাবধান, একটুও নড়বে না, তাহলে ওদের মত তোমাকেও এক্ষুণি যমালয়ে পাঠাব।

বন্দীর দু'চোখে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। এতোক্ষণ তার চোখ দুটো চিরতরে অন্ধ হয়ে যেতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো সে—দস্যু বনহুর!

হিম্মৎ খাঁ মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলো, তার কণ্ঠ দিয়েও বেরিয়ে এলো—দস্যু বনহুর!

জ্যোতির্ময় গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললো—হাঁ, আমি তোমাদের যমদূত দস্যু বনহুর।

দিপালীর দু'চোখে শুধু বিস্ময় নয়, দু'চোখে তার বিরাট একটা জিজ্ঞাসা, একটা প্রশ্ন। সেও মনে মনে বলে উঠলো—রাজকুমার জ্যোতির্ময় তাহলে দস্যু বনহুর!

বনহুরের রিভলভারের আগা তখন হিম্মৎ খাঁর বুকে ঠেকে আছে।

হিম্মৎ খাঁ একচুল নড়তে পারছে না।

তার সহচরদের রক্ত গড়িয়ে আসছে পায়ের নিচে। হিম্মৎ খাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। বনহুর ওকে লক্ষ্য করে বললো—মনে রেখো শয়তান, ওদের মতো তোমাকে এতো সহজে পারপারে পাঠাবো না। চলো এগিয়ে চলো, নিজের হাতে খুলে দাও মিঃ হেলালীর দেহের লৌহশিকল।

দিপালী অবাক হয়ে দেখছে—একি সে স্বপ্ন দেখছে না সত্য, ভেবে পাচ্ছে না। জ্যোতির্ময় যে দস্যু বনহুর, এ কথা সে ভাবতে পারছে না কিছুতেই।

হিম্মৎ খাঁর কণ্ঠনালী শুকিয়ে এসেছে। সে নিরুপায়ভাবে এগিয়ে গেলো, তারপর নিজের হাতে মিঃ হেলালীর দেহের বন্ধন মুক্ত করে দিলো।

বনহুর এবার মিঃ হেলালীর দেহের মুক্ত লৌহশিকল পরিয়ে দিলো হিম্মৎ খাঁর শরীরে, তারপর বললো—এই গোপন কক্ষে তুমি বন্দী থাকো—এখানে কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না। যতোদিন মিঃ হেলালীকে বন্দী করে রেখেছিলে ততোদিন তোমাকে পৃথিবীর বুকে নরক জ্বালা পোহাতে হবে। প্রতিদিন তোমার দেহে একশত করে বেত্রাঘাত করা হবে আর

তোমাকে জীবিত রাখার জন্য এই মৃতদেহগুলো থেকে গলিত মাংস ভক্ষণ করানো হবে.....

দিপালী ছুটে আসে, ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠে—রাজকুমার, আমার বাবাকে আপনি ক্ষমা করুন।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দস্যু বনহুর—ক্ষমা! ক্ষমা করবো তোমার বাবাকে? শয়তানকে ক্ষমা করা চলে তবু তোমার বাবাকে ক্ষমা করা চলে না।

এবার বনহুর মিঃ হেলালীর দেহের দিকে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বলে—আপনি ভুল করেছিলেন এবং সে কারণেই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করলেন।

মিঃ হেলালী বনহুরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন—আপনি দস্যু হয়ে এতো মহৎ, কি বলে যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবো.....

থাক সে কথা। এখন আপনি কান্তা বারে গিয়ে পুলিশ অফিসে ফোন করুন। আপনাকে আমি সাহায্য করছি চলুন। দিপালী, তুমিও মিঃ হেলালীকে সাহায্য করবে বলে আশা করি।

দিপালী কাতর চোখে বারবার হিম্মৎ খাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো এবং তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রুধারা।

বনহুর বললো—দিপালী, তুমি ওর আসল পরিচয় জানো না। হিম্মৎ খাঁ তোমার বাবা নয়, সে তোমাকে ছোটবেলায় চুরি করে এনেছিলো। সে একজন চির অসৎ ব্যক্তি। পরে সব তোমাকে খুলে বলবো, কারণ এখন মিঃ হেলালীর দ্রুত চিকিৎসার দরকার। হাঁ আর একটি কথা, রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের ছদ্মবেশে আমি অনেক সময় তোমার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করেছি, সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো দিপালী, তাছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না। তোমার অজান্তে আমি তোমার কাছ থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছি...

আপনি তাহলে মস্তকহীন নরহত্যার...

হাঁ দিপালী, ও আমার নরহত্যা নয়—রক্তের নেশা! রক্তের নেশায় আমি উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলাম। দিপালী, তোমাদের কান্তা বারেরই একটি সুন্দর কক্ষে সেই নর শয়তানদের মস্তকগুলো স্তূপাকার করে সাজিয়ে রেখেছি।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠে দিপালী—কান্তা বারের অভ্যন্তরে সেই কাটা মস্তকগুলো স্তূপাকার করে সাজি রেখেছেন?

হাঁ, হাঁ দিপালী। পুলিশ এলে তাদের কাছে জানাবে, তারা সন্ধান করে নেবে কোথায় সেই মস্তকের স্তূপ রয়েছে।

মিঃ হেলালী দেয়ালে ঠেশ দিয়ে ধুঁকছিলেন।

বনহুর তাঁকে ধরে বললো—চলুন উপরে চলুন। এসো দিপালী, ওর ঐপাশে ধরুন।

দিপালী এসে মিঃ হেলালীর একটি হাত কাঁধের উপর তুলে নিলো।

বনহুর আর দিপালীর সহায়তায় সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে চললেন মিঃ হেলালী। ক্ষুধা-পিপাসায় তিনি এতো বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, একটি কথাও বলতে পারছিলেন না। টেনে টেনে অতিকষ্টে পা তুলে এগুচ্ছিলেন।

একসময় পৌঁছে যায় ওরা সুড়ঙ্গপথের শেষ মুখে। সেখানে একটি লিফ্‌ট ছিলো।

বনহুর মিঃ হেলালীকে লিফ্‌টে তুলে ধরলো।

দিপালীও এসে দাঁড়ালো লিফ্‌টের উপরে।

একটা বোতামে চাপ দিতেই লিফ্‌টখানা সাঁ সাঁ করে উপরে উঠতে লাগলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

লিফ্‌ট এসে থেমে গেলো। লিফ্‌টের দরজা আপনা আপনি খুলে গেলো।

বনহুর এবং দিপালী মিঃ হেলালী সহ নেমে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে লিফ্‌ট নেমে গেলো নিচে।

দিপালী বললো—কান্তা বারে এখনও বহু শয়তান আত্মগোপন করে আছে।

বনহুর বললো—সবাইকে আমি তাদের উপযুক্ত যায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি, কাজেই কান্তা বার শূন্য। কান্তা বারের অতল গহ্বরে তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে হিম্মত খাঁ। লিফ্‌টের চাবি আমি ভেঙ্গে দিয়েছি। লিফ্‌টখানা আর কোনোদিন উপরে উঠে আসবে না বা কেউ কোনোদিন ঐ অন্ধকার কারাকক্ষের সুড়ঙ্গপথে নিচে নেমে যেতে পারবে না।

মিঃ হেলালীকে সঙ্গে করে কান্তা বারের সুসজ্জিত একটি কক্ষে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর দিপালী।

দিপালী অবাক হয়ে গেলো।

সে জ্ঞান হবার পর কান্তা বার কোনোদিন এমন নীরব দেখেনি। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। সবাই গেলো কোথায়?

বনহুর মিঃ হেলালীর হাতে রিসিভার তুলে দিয়ে বললো—পুলিশ অফিসে ফোন করুন।

মিঃ হেলালী বললেন—আমার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে, আমি কোনো কথা বলতে পারছি না।

বেশ, আমিই করছি। বনহুর নিজেই পুলিশ অফিসে ফোন করলো —হ্যালো...কে কথা বলছেন?

ওপাশ থেকে কণ্ঠ ভেসে এলো মিঃ হাসানের...আমি ইন্সপেক্টর হাসান বলছি...হ্যালো আপনি কে এবং কোথা থেকে বলছেন...

...দস্যু বনহুর...কান্তা বার থেকে বলছি...

মিঃ হাসানের হাত থেকে রিসিভার খসে পড়তে যাচ্ছিলো, তিনি রিসিভার শক্ত করে ধরে বললেন...দস্যু বনহুর...তুমি...তুমি...হাঙ্গেরী ...কারাগার থেকে পালিয়েছো...

...না, হাঙ্গেরী কারাগারে আমি ছিলাম না...যাকে হাঙ্গেরী কারাগারে রাখা হয়েছে, সে ঠিকই সেখানে রয়েছে...আপনারা পুলিশ বাহিনী এবং পুলিশ ভ্যান নিয়ে এক্ষুণি কান্তা বারে চলে আসুন... মিঃ হেলালী মুক্তি পেয়েছেন...তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন...শীঘ্র চিকিৎসার প্রয়োজন...

মিঃ হাসান যেন থ' বনে গেছেন। দস্যু বনহুর স্বয়ং তার কাছে পুলিশ অফিসে ফোন করেছে, এটা যেন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, কারণ দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে ফোন করলো কে সে?

মিঃ হাসান পুলিশ ফোর্স নিয়ে কান্তা বারে যাবেন কিনা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি কয়েক স্থানে ফোন করলেন। প্রথমে করলেন মিঃ জায়েদী, মিঃ জাফরী এবং কয়েকজন পুলিশ অফিসারের কাছে।

সবাই মিঃ হাসানের ফোন পেয়ে বিস্মিত-হতবাক স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা জানেন দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী আছে কিন্তু একি কথা,

দস্যু বনহুর কান্তা বার থেকে এই মুহূর্তে ফোন করেছে, এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ওয়্যারলেসে মিলিটারী ক্যাম্পে জানিয়ে দিলেন মিঃ হাসান, এক্ষুণি যেন কিছুসংখ্যক মিলিটারী নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা চলে আসেন।

সমস্ত পুলিশ মহলে সাড়া পড়ে গেলো।

শহরময় ছুটোছুটি শুরু হলো পুলিশ আর মিলিটারী ভ্যানে!

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ জাফরী পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন কান্তা বারের সম্মুখে।

ততক্ষণে ক্যাপ্টেন হুদা কিছুসংখ্যক মিলিটারী সহ এসে পৌঁছে গেছেন।

একসঙ্গে সবাই মিলে অস্ত্র বাগিয়ে ধরে কান্তা বারে প্রবেশ করে। মিলিটারীরা সমগ্র কান্তা বার ঘেরাও করে ফেলে।

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ জাফরী পুলিশ বাহিনীকে কান্তা বারের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়বার নির্দেশ দিয়ে নিজেরা রিভলভার উদ্যত করে প্রতিটি কক্ষে সন্ধান চালাতে শুরু করেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ সন্ধান করতে হয় না, কান্তা বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই নজরে পড়ে একটি কক্ষের সোফায় জীর্ণ ক্ষত-বিক্ষত দেহে মিঃ হেলালী বসে রয়েছেন। তাঁকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেন না পুলিশ প্রধানদ্বয়।

তবে বেশিক্ষণ বিলম্বও হয় না চিনতে, মিঃ জায়েদীই প্রথমে বলেন— কে আপনি? মিঃ হেলালী না?

ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে বললেন মিঃ হেলালী—হাঁ আমি..... হেলালীই বটে.....আপনারা আমাকে শীঘ্র বাঁচান.....

মিঃ জায়েদী মিঃ হেলালীর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন— বুঝেছি শয়তান দস্যু বনহুর আপনাকে বন্দী করে রেখেছিলো..... বলুন কোথায় সে?

মিঃ জাফরীর দু'চোখেও আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিলো। তিনি মিঃ হেলালীর করুণ অবস্থা দেখে রাগে ফেটে পড়ছিলেন। মনে করেছেন দস্যু বনহুর মিঃ হেলালীকে আটক রেখে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে মৃতপ্রায় করে ফেলেছে। মিঃ জাফরী চিৎকার করে বলেন—কোথায় সেই নরহন্তাকারী দস্যু?

মিঃ হেলালী বললেন—দস্যু বনহুরকে আপনারা অযথা গালমন্দ করছেন। সে-ই আমাকে উদ্ধার করেছে।

মিঃ হেলালীর কথা কারো কানে গেলো না, সবাই তখন হন্তদন্ত হয়ে দস্যু বনহুরের সন্ধান করে চলেছে।

মিঃ হেলালীর পাশে দু'জন পুলিশ তাঁর সেবা করতে লাগলো। মিঃ জায়েদী, মিঃ জাফরী ও পুলিশ বাহিনী সমগ্র কান্তা বারে অনুসন্ধান করে চললো।

সমস্ত কক্ষ প্রায় শূন্য।

হঠাৎ একটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে আরষ্ট হয়ে গেলেন মিঃ জায়েদী এবং মিঃ জাফরী। তারা দেখলেন সেই কক্ষমধ্যে কতকগুলো ছিন্ন মস্তক স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। একটা উৎকট গন্ধও তাদের নাকে প্রবেশ করলো। মিঃ জায়েদী এবং মিঃ জাফরী নাকে রুমালচাপা দিলেন। তারা বুঝতে পারলেন, গত কিছুদিন যাবৎ যে মস্তকবিহীন লাশগুলো কান্দাই শহরে পাওয়া গেছে সেইসব লাশের মস্তকগুলোই এখানে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে।

সুইপারের সাহায্যে ছিন্ন মস্তকগুলো গুছিয়ে রাখতেই চিনতে পারলেন এগুলো কোন্‌টা কার মাথা। এই নরমুন্ডগুলোর মধ্যে একটা রয়েছে হতভাগ্য মির্জা মোহাম্মদের। খাদ্য বিভাগীয় প্রধানের সহকারী ছিলেন তিনি।

অবশ্য মির্জা মোহাম্মদ কেমন লোক ছিলো, সে কথা সবাই জানতো। তিনি সরকারের লোক বলে সবাই তাকে একটু সমীহ করতো। কিন্তু সকলেই বিরূপ ছিলো তার উপর কারণ এই ব্যক্তি দেশের জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে খাদ্য গোপনে পাচার করতো দেশের বাইরে, তার বিনিময়ে পেতো লাখ লাখ টাকা।

শুধু মির্জা মহাম্মদই নয়, এমনি ধরনের যারা দেশের গোপন শত্রু তাদের অনেকেরই ছিন্ন মস্তক রয়েছে এই মুন্ডস্তূপের মধ্যে।

তবুতো হত্যা—তাই হত্যাকারী অপরাধী নিঃসন্দেহে। কাজেই পুলিশ বাহিনী হত্যাকারীকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না!

এসব হত্যাকান্ড যে দস্যু বনহুরেরই কাজ তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার, দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাকক্ষে আটকে রাখা সত্ত্বেও সে কিভাবে বেরিয়ে এলো!

মিঃ জাফরী হাঙ্গেরী কারাগারে ফোন করে আরও হতবাক হয়ে পড়েছেন। জেল প্রধান জানিয়েছেন দস্যু বনহুর ঠিক জায়গায়ই বন্দী অবস্থায় রয়েছে। পুলিশ প্রধানগণ এ সংবাদে আরও বিস্মিত হয়েছেন, তবে কার এমন দুঃসাহস যে দস্যু বনহুর নামে নিজকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে এবং এসব হত্যালীলা সংঘটিত করে চলেছে!

কান্তা বারে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও দস্যু বনহুর নামী কোনো ব্যক্তিকে পাওয়া গেলো না।

দিপালীকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তবু কোনো ফল হলো না।

মিঃ জাফরী এবং জায়েদী যখন দিপালীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তখন হঠাৎ একটি পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো, সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—স্যার, কান্তা বারের একটি কক্ষে অনেকগুলো লোক আটক রয়েছে তারা কারা এবং কে তাদের সেখানে আটক করে রেখেছে জানা যাচ্ছে না।

শোনামাত্র মিঃ জাফরী বললেন—দেখুন মিঃ জায়েদী, আমি যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। ভেবেছিলাম কান্তা বারের লোকগুলো গেলো কোথায়? সব তো আর হাওয়ায় উধাও হয়নি।

মিঃ জায়েদী সহ মিঃ জাফরী এবং আরও কয়েকজন চললেন সেই কক্ষ অভিমুখে যে কক্ষমধ্যে আটক রয়েছে কান্তা বারের কর্মচারীরা!

দিপালীও না গিয়ে পারলো না, কারণ তার মনেও নানারকম প্রশ্ন আলোড়ন জাগিয়েছে। দস্যু বনহুরই তাহলে এসব কান্ড করেছে।

পুলিশ প্রধানদের সঙ্গে দিপালীও এগুলো।

যে কক্ষমধ্যে কান্তা বারের কর্ম চারিগণকে আটক করে রাখা হয়েছে সেই কক্ষে পৌঁছে সবার চোখে বিস্ময় জাগলো। এতোগুলো লোককে একই সঙ্গে কি করে জড়ো করা হয়েছে। সবাই সংজ্ঞাহীন এবং স্তূপাকার অবস্থায় রয়েছে দেখতে পেলেন পুলিশ অফিসারগণ।

দিপালীর চোখ দুটো গোলাকার হয়ে পড়েছে। রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের এই কাজ! সে কখন কেমন করে এমনভাবে অতি সতর্কতার সঙ্গে এতোগুলো লোককে কাবু করে ফেলেছে?

দিপালীর ভাবনার শেষ নেই। সে আরও ভাবছে, রাজকুমারবেশী দস্যু বনহুর একটু পূর্বেই কান্তা বারে ছিলো, সেই বা গেলো কোথায়?

দিপালী জানালো, যারা এই কক্ষে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছে এরা সবাই দোষী। কান্তাবারের অভ্যন্তরে যে গোপন দুস্কর্ম চলতো তার সহকর্মী এরা!

মিঃ জাফরী দিপালীকেও বাদ দিলেন না, আটক বন্দীদের সঙ্গে তাকেও বন্দী করে নিয়ে চললেন। যদিও দিপালী বলেছিলো আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

❑

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ প্রধান হাঙ্গেরী কারাগারে পৌঁছে দস্যু বনহুর ভ্রমে আটক বন্দীকে পরীক্ষা করেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, কারণ এটাই যে দস্যু বনহুর তাতে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন।

মিঃ জাফরী নিজে হাঙ্গেরী কারাগারে প্রবেশ করে এক নম্বর লৌহ কারাকক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে আছেন আরও কয়েকজন জাঁদরেল পুলিশ প্রধান এবং মিলিটারী ক্যাপ্টেন মিঃ হুদা।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রুক্ষ একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে ললাটের চারপাশে। দীপ্ত উজ্জল নীল দুটি চোখ কেমন যেন নিষ্প্রভ উদাসীন। এগিয়ে এলো বন্দী।

মিঃ জাফরী তীক্ষ্ণ নজরে তাকালেন বন্দীর মুখের দিকে। হঠাৎ মনে পড়লো কোনো একটি কথা। মিঃ জাফরী লৌহশিকের ফাঁক দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে একটানে ছিঁড়ে ফেললেন বন্দীর হাতের পাশের জামার কিছু অংশ। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো দক্ষিণ বাহুখানা। মিঃ জাফরীর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠলো, কারণ তিনি জানেন দস্যু বনহুরের দক্ষিণ বাহুতে একটি বড় জট বা আঁচলির চিহ্ন ছিলো। এর বাহুতে কোনো আঁচিল বা জট নেই।

মিঃ জাফরীর মুখোভাব লক্ষ্য করে অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিস্মিত হলেন।

মিঃ জাফরী বললেন—সর্বনাশ, আমিও শেষ পর্যন্ত এমন একটা ভুল করে বসলাম! এ দস্যু বনহুর নয়, নিশ্চয়ই এ সেই ব্যক্তি যাকে একবার ভুল করে হাঙ্গেরী কারাগারে আটক করা হয়েছিলো।

একসঙ্গে পুলিশ অফিসারগণ অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন—বলেন কি, এ দস্যু বনহুর নয়?

না বললেন মিঃ জাফরী। তাঁর মুখোভাবে একটা লজ্জাসঙ্কোচ-দ্বিধা ভরা ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি পুলিশ অফিসারদের নিয়ে হাঙ্গেরী কারাগার ত্যাগ করলেন।

শাহান শাহ থেকে প্রদীপ কুমারকে দস্যু বনহুর ভ্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। মুক্তি পেলো রাজকুমার প্রদীপ।

এমন একটা অবস্থার জন্য পুলিশ মহল তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং তাঁকে জাহাজযোগে দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

সন্ধ্যায় জাহাজ শাহান শাহ্ কান্দাই বন্দর ত্যাগ করবেন।

রাজকুমার প্রদীপকে তার ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে এলেন মিঃ জাফরী ও তাঁর দু'জন সহকারি। ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো তাঁদের কানে।

অদ্ভুত সে অট্টহাসি! চমকে উঠলেন মিঃ জাফরী এবং তাঁর সঙ্গীরা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকালেন চারদিকে। হঠাৎ এ শব্দ কোথা থেকে ভেসে এলো বুঝতে পারলেন না তাঁরা।

জাহাজ ছাড়ার সংকেতধ্বনি হয়েছিলো, তাই পুলিশ প্রধানগণ বিলম্ব না করে নেমে পড়লেন। জাহাজখানা ততোক্ষণে কান্দাই বন্দর ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

প্রদীপ কুমার বসে ছিলো তার ক্যাবিনে। শরীর-মন দুই-ই খারাপ।

সন্ধ্যা ঘনীভূত হয়ে এসেছে।

জাহাজের ক্যাবিনে ক্যাবিনে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

প্রদীপ কুমার ভাবছে তার বন্দী জীবনের দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা। দস্যু বনহুর ভ্রমে হাঙ্গেরী কারাগারে তার প্রতি কম নির্যাতন চালানো হয়নি। প্রতিদিন তাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। সমস্ত দিন পর তাকে যে খাবার দেওয়া হতো তা অতি সামান্য এবং নগণ্য। অতি কষ্টে তা

গলধঃকরণ করতে হতো। কিছুদিন পূর্বে একবার তাকে এমনিভাবে বন্দী হতে হয় এবং হাঙ্গেরী কারাগারে মাসের পর মাস কত না কষ্ট পোহাতে হয়েছিলো। আবার তার ভাগ্যে সেই ভুলের পালা—সেই নির্যাতন, সেই অন্যায় অবিচার.....

হঠাৎ একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো তার কানে জাহাজখানা তখন বন্দর ত্যাগ করে অনেক দূর সরে এসেছে। প্রদীপ কুমার ফিরে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো সে। জমকালো পোশাকপরা সেই ছায়ামূর্তি, যাকে সে বহুদিন পূর্বে দেখেছিলো। আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আপনি! হাঁ, আমি দস্যু বনহুর।

প্রদীপ কুমারের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে, সে সহসা কিছু বলতে পারলো না। যদিও সে কিছু বলতে চাইছিলো কিন্তু গলাটা যেন রুদ্ধ হয়ে এসেছে ভিতর থেকে।

দস্যু বনহুর এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একখানা হাত রাখলো, একটু হেসে বললো—কুমার বাহাদুর, আমি দুঃখিত যে, পুলিশ মহল বারবার একই ভুল করে অযথা আপনাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। আপনার দুর্ভাগ্য, কারণ আপনি হুবহু আমারই মত দেখতে।

প্রদীপ কুমার কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন, সে পূর্বের মতোই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—পুলিশ মহল এবার নিজেদের ভুলের জন্য নাক-কান মলেছে, আর কোনোদিন এমন ভুল আর হবে না।

এবার প্রদীপ কুমার কথা বললো—আমি পুলিশ মহলকে বিশ্বাস করি না।

সে কথা অবশ্য সত্য কিন্তু মনে হয় আর তাদের এমন ভুল হবে না, কারণ তারা ডায়রীর পাতায় লিখে রেখেছে দস্যু বনহুরের দক্ষিণ বাহুতে.....বলে বনহুর নিজের হাতের জামার অংশ তুলে ধরে বললো—এই জটের কথা উল্লেখ করা আছে, কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত।

প্রদীপ কুমার দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর আসন গ্রহণ করে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর একমুখ ধোঁয়া ত্যাগ করে বললো—আপাততঃ আমি আপনার সঙ্গে আছি।

প্রদীপ কুমারের মুখমণ্ডলে একটি দীপ্ত খুশিভরা ভাব ছড়িয়ে পড়ে। বলে প্রদীপ কুমার—আপনি সঙ্গে থাকলে অনেক খুশি হবো।

দস্যু বনহুরকে পেয়ে প্রদীপ কুমার সত্যিই খুশি হলো, কারণ প্রদীপ কুমার জানে দস্যু বনহুর তার কোনো ক্ষতি করবে না বরং তাকে সহায়তা করবে। বেশ কিছুদিন হাঙেরী কারাগারে বন্দী থেকে প্রদীপ কুমার হাঁপিয়ে পড়েছিলো। দেহের দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও তার দুর্বল হয়ে পড়েছিলো অনেকটা।

কান্দাই থেকে মন্থনা দীপ বহুদূরের পথ। প্রায় তাকে জাহাজ শাহান শাহে কাটতে হবে। কাজেই এ অবস্থায় বনহুরকে পাশে পাওয়া তার পক্ষে সৌভাগ্য বলা যায়।

বনহুর আপন মনে সিগারেট পান করছিলো। তার পাশেই আর একটি আসনে বসে আছে প্রদীপ কুমার।

ক্যাবিন নিস্তব্ধ।

শুধু জাহাজের একটানা ঝকঝক শব্দের সঙ্গে সাগরবক্ষের জল রাশির উচ্ছল শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রদীপ কুমার আন মনে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

বনহুর হঠাৎ বলে উঠলো—প্রদীপ কুমার, আপনি আমার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট, তাই নয় কি?

প্রদীপ কুমার ফিরে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে—না না, আমি মোটেই অসন্তুষ্ট নই, কারণ আপনি এ ব্যাপারে দোষী নন। বরং আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করি এজন্য।

প্রদীপ কুমারের কথায় বনহুরের মুখমণ্ডল খুশিতে ভরে উঠলো, বললো—সত্যি!

হাঁ।

বনহুর প্রদীপ কুমারের সঙ্গে হাত মিলালো।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের। জেগে উঠতেই অনুভব করলো পাশে কেউ নেই। ভাল করে হাতড়িয়ে দেখলো তার অনুমান মিথ্যা নয়, সমস্ত ক্যাবিন অন্ধকার।

বনহুরের বেশ মনে আছে, সে এবং প্রদীপ কুমার যখন ঘুমাবার জন্য বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে পড়ে তখন ক্যাবিনে ডিমলাইট জ্বলছিলো। কিন্তু এখন ক্যাবিনে কোনো আলো নেই। আলো নিভলো কেমন করে আর প্রদীপ কুমারই বা গেলো কোথায়?

বনহুর বিছানা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো।

আজ এক সপ্তাহ হলো তারা এ ক্যাবিনে আছে। প্রতিদিন রাতে পাশাপশি শোয় ওরা। কত কথা হয় ওদের দু'জনের মধ্যে। প্রদীপ কুমার এবং দস্যু বনহুরের মধ্যে একটা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব জমে উঠেছে। প্রদীপ কুমার তার মনের কথা বলেছে বনহুরের কাছে। বনহুর মনোযোগ সহকারে শুনেছে সব কথা।

বনহুর হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলো, কিন্তু আলো জ্বললো না।

বনহুর ভাবলো বাথরুমে যায়নি তো? তাই সে ডাকলো— প্রদীপ কুমার...প্রদীপ কুমার...

কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ এলো না।

কয়েক মিনিট পায়চারী করলো বনহুর, তবে কি সে ক্যাবিনের বাইরে কোথাও গেছে?

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন প্রদীপ কুমার ফিরে এলো না তখন বনহুর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। সমস্ত জাহাজ অন্ধকার, শুধু সার্চলাইটের তীব্র আলোর ছটা সাগরবক্ষে রশ্মি বিস্তার করে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডেকের ধারে এসে দাঁড়ালো বনহুর, চারিদিকে নিকষ অন্ধকার। আকাশে দু'চারটে তারা মিটমিট করছে।

অপূর্ব না হলেও আকাশটা মনোরম মনে হচ্ছিলো। কালো শাড়ীর মাঝে যেন জড়ির বুটি গুলো ফুটে উঠেছে।

বনহুর বেশিক্ষণ ডেকের ধারে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সে নিজের মনে। আজ এক সপ্তাহ কেটে গেলো এ জাহাজে কিন্তু এমন তো ঘটেনি কোনোদিন। আজ সমস্ত জাহাজ এমন অন্ধকার কেন আর প্রদীপ কুমারই বা গেলো কোথায়? ফিরে এলো বনহুর ক্যাবিনে। অন্ধকারেই হাতড়িয়ে সিগারেট কেসটা হাতে তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে গুজলো বনহুর, তারপর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একটা সোফায় বসে পড়লো। প্রদীপ কুমারের অনেক কথাই মনে আলোড়ন জাগালো। বলেছিলো সে, তার বাবা-মা এবং স্ত্রী তার জন্য উন্মাদ প্রায় হয়ে উঠেছে। কারণ সে প্রায় পুরো দু'মাস আটক ছিলো হাঙ্গেরী কারাগারে। এতোদিন সে কেন দেশে ফিরে যায়নি জানে না কেউ। সে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই টেলিগ্রাফ করে দিয়েছিলো, আমি সুস্থ আছি এবং অচিরেই দেশে ফিরে আসছি। প্রদীপ কুমার আরও বলেছিলো তার টেলিগ্রাফ পেয়ে নিশ্চয়ই তার বাবা-মা এবং স্ত্রী মীরা উন্মুখ প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে।

বনহুরের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো। প্রদীপ কুমারের কোনো বিপদ ঘটেনি তো। সে এমনই ঘুমিয়ে পড়েছিলো যার জন্য এতোটুকু টের পায়নি ও গেলো কোথায়।

বনহুর ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনের দিকে পা বাড়ালো। ক্যাপ্টেন তার টেবিলে বসে একটা ম্যাপ দেখছিলেন। সম্মুখে দিকদর্শন যন্ত্রে বিরাট আকার মেসিনটা দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর ক্যাপ্টেনের কাঁধের উপর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সম্মুখের দিকে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বললো—ক্যাপ্টেন।

চমকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন মিঃ হুর্ড্। কারণ এতো রাতে কে এলো তাঁর ক্যাবিনে।

ক্যাপ্টেন ফিরে তাকাতেই বললো বনহুর—জাহাজখানা অন্ধকার কেন জানতে পারি কি?

ক্যাপ্টেন পুনরায় ম্যাপে মনোযোগ দিয়েছিলেন, তিনি ম্যাপখানার উপর দৃষ্টি রেখেই বললেন—মেইন সুইচ নষ্ট হয়ে গেছে।

বনহুর বললো—আলো জ্বলবে কখন?

মেইন সুইচ ঠিক হলেই আলো জ্বলবে।

কিন্তু কখন ঠিক হবে?

যতক্ষণ না মেরামত হয়। যান ক্যাবিনে বসে থাকুন গে।

ক্যাপ্টেনের নীরস ব্যবহারে বনহুর ক্ষুদ্ধ হলো না। সে ফিরে এলো ক্যাবিনে। ইচ্ছা করেই সে প্রদীপ কুমার সম্বন্ধে কোনো কথা বললো না বা কিছু জিজ্ঞাসা করলো না।

ক্যাবিনে আসতেই দপ করে আলো জ্বলে উঠলো। সমস্ত জাহাজ-খানা আলোকিত হলো। বনহুর ডিমলাইটের সুইচ অপ করে পাওয়ার ফুল আলো জ্বালালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বিছানার দিকে, কোনো কিছু নজরে পড়ে কিনা। হঠাৎ বালিশের পাশে নিচে একটি ছোট রুমাল তার নজরে পড়লো।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রুমালখানা তুলে নিলো হাতে। রুমালখানা হাতে নিতেই বুঝতে পারলো সেই রুমালখানায় ক্লোরফরম মাখানো আছে। নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজের নাক ঢাকলো বনহুর, তারপর ডান হাতে সেই ছোট রুমালখানা মেলে ধরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। এক কোণে একটি রেশমী সুতার ছোট ফুল এবং অপর কোণায় ডি, আর, দুটি মাত্র ইংরেজি শব্দ। বনহুর বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই প্রদীপ কুমারকে কে বা কারা ক্লোরফরম অবস্থায় ক্যাবিন থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু যাবার সময় তার রুমালখানা ভুলবশতঃ ফেলে গেছে।

বনহুর রুমালখানা প্যান্টের পকেটে রেখে ফিরে দাঁড়াতেই একটা নারীকণ্ঠের অট্টহাসি ভেসে এলো তার কানে।

চমকে উঠলো বনহুর।

একি আশ্চর্য, নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি.....বনহুর বিস্মিত হলো, বেরিয়ে এলো সে ক্যাবিনের বাইরে। এদিক ওদিক তাকালো কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না।

চারিদিকে এখন আলো ঝলমল করছে, সব নজরে পড়ে।

বনহুর ফিরে এলো পুনরায় ক্যাবিনে। সমস্ত মন জুড়ে গভীর একটা রহস্যময় চিন্তাধারা তোলপাড় করতে লাগলো।

আর ঘুমাতে পারলো না বনহুর, সমস্ত রাত সিগারেটের পর সিগারেট পান করে চললো। এ্যাসট্রের মধ্যে জমে উঠলো অর্ধদগ্ধ সিগারেটের স্তূপ।

ভোর হলো এক সময়।

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করে সুন্দরভাবে হাতমুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলো, তারপর ফিরে এলো ক্যাবিনের মধ্যে। তোয়ালে দিয়ে মুখ-খানা মুছে নিয়ে তাকালো সম্মুখে যেখানে প্রদীপ কুমারের জামা-কাপড় ঝুলছে।

পরে নিলো সে প্রদীপের পোষাকগুলো। ক্যাবিনের আয়নার সম্মুখে দেখলো সে একেবারে প্রদীপ কুমার বনে গেছে। তার চেহারার এতোটুকু পার্থক্য নেই যে সে প্রদীপ কুমার নয়।

এমন সময় বয় এসে খাবার দিয়ে গেলো।

বনহুর খাবার খেলো, তারপর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিয়ে বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। ডেকের ধারে এসে দাঁড়ালো, দৃষ্টি তার সম্মুখে সাগরবক্ষে সীমাহীন জলরাশির দিকে।

জাহাজখানা আর এক সপ্তাহ পর মন্থনা দ্বীপে এসে পৌঁছবে। কিন্তু একি বিভ্রাট হলো, প্রদীপ কুমারকে কে বা কারা উধাও করলো।

বনহুর সিগারেট পান করছে আর ভাবছে, একটা নারীকণ্ঠের অট্টহাসি গতরাতে তাকে শুধু চমকেই তোলেনি, বিস্মিতও করেছে। নিশ্চয়ই কোনো রহস্যময় মায়াচক্র জড়িয়ে আছে সেই হাসির সঙ্গে। বনহুর সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তার নজরে পড়লো দুটি তরুণী ওদিকে রেলিংয়ে ঠেশ দিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এরা হিন্দল থেকে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ জাহাজখানা যখন কান্দাই থেকে ছাড়ে তখন এ তরুণীদ্বয় জাহাজে ছিলো না। অবশ্য এ জাহাজে প্রায় বারো-তেরোজন মহিলাযাত্রী ছিলো পূর্ব হতেই। একটি তরুণীর সঙ্গে ইতিমধ্যে তার পরিচয় ঘটেছিলো। তরুণী তার বিধবা মাকে নিয়ে সিমলাই যাচ্ছে। জাতিতে তারা মারাঠা। মেয়েটি শিক্ষিতা, কাজেই সে মারাঠা ভাষা ছাড়াও সুন্দর ইংরেজি বলতে পারে। ওর নাম সিমকী, সুন্দর স্বচ্ছস্বাভাবিক ওর চালচলন।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো টেলিভিশন ক্যাবিনে। তারপর প্রায়ই সিমকীর সঙ্গে দেখা হতো জাহাজের ডেকে। বনহুর সিগারেটের ধোঁয়ার ফাঁকে তাকিয়ে আছে আড়নয়নে—মেয়ে দুটি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলো।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো ওরা।

বনহুর দেখলো দু'জন তরুণীর মধ্যে একজন সিমকী, অপরজন নতুন মেয়ে!

নতুন মেয়েটির সঙ্গে হাসছিলো সিমকী। আর কি যেন বলাবলি করছিলো। হয়তো সমুদ্রে জলরাশির উচ্ছল তরঙ্গ নিয়েই আলাপ হচ্ছিলো দু'জনার মধ্যে।

বনহুর ওদের দেখেও না দেখার ভান করে রইলো। আপন মনে সে সিগারেট পান করে চলেছে।

সিমকী আর নতুন তরুণী চলে গেলো ওদিকে।

বনহুর এবার কিছু ভেবে নিলো, তারপর পা বাড়ালো ক্যাবিনের দিকে। কিন্তু ক্যাবিনে প্রবেশ করে সে আসন গ্রহণ করতে পারলো না, একটা অস্বস্তি তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। সে পুনরায় বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে।

ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে আসতেই তার পায়ের কাছে একখানা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা এসে গেঁথে গেলো। থমকে দাঁড়ালো বনহুর, তারপর উবু হয়ে ছোরাখানা তুলে নিলো সে হাতে। আশ্চর্য হয়ে দেখলো ছোরার বাঁটে ছোট একটি কাগজের টুকরা বাঁধা রয়েছে।

বনহুর ছোরার বাঁট থেকে কাগজের টুকরাখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে—

প্রদীপ কুমার, বন্ধুকে হারিয়ে বেশ
চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাই না?
কিন্তু আপনার বন্ধু স্বাভাবিক
মানুষ নয়। তার পরিচয় আপনি
জানেন না। জানলে তাকে পাশে
আশ্রয় দিতেন না। আপনি অযথা

মন খারাপ করবেন না। তাকে
আমি কৌশলে বন্দী করেছি।
আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী—
'চন্দনা'

বনহুরের ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে। সে বার দুই চিঠিখানা পড়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে রেখে ফিরে যায় ক্যাবিনে।

পুনরায় চিঠিখানা বের করে মেলে ধরে চোখের সম্মুখে, তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো হাঃ হাঃ হাঃ করে।

উঠে দাঁড়ায় বনহুর কিন্তু ফিরে তাকিয়েই বিস্মিত হয়—তার পিছনে সিমকী সঙ্গিনী সহ দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর মনোভাব চেপে নিয়ে একটু হেসে বলে—ও আপনি!

সিমকীই জবাব দেয়—হাঁ, আমি সিমকী। এলাম আমার বান্ধবীকে নিয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। কিন্তু আপনার বন্ধুকে দেখছিনা তো?

বনহুর পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—বন্ধু! হাঁ আমিও কিন্তু ওকে দেখছি না। হয়তো জাহাজের কোথাও থাকবে! বসুন মিস সিমকী।

সিমকী ও তার বান্ধবী আসন গ্রহণ করলো। বললো সিমকী—এ আমার বান্ধবী চঞ্চল।

বনহুরও আসন গ্রহণ করে বললো—চমৎকার নামটা ওর। হয়তো উনি খুব চঞ্চল, তাই...

হাঁ, ঠিকই বলেছেন মিঃ প্রদীপ কুমার, ছোটবেলায় আমার বান্ধবী অত্যন্ত চঞ্চল ছিলো কিনা। কিরে, অমন চুপ করে আছিস্ কেন, কথা বল্ কিছু।

হেসে বললো বনহুর—আপনার বান্ধবীকে দেখে কিন্তু মোটেই চঞ্চলা মনে হচ্ছে না। বড্ড সাধু মেয়ে বলেই...

বনহুরের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলে উঠে সিকমী—আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল মিঃ প্রদীপ কুমার। যাক, এবার আমরা কেন এলাম তাই বলি?

নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই বলুন?

আমার বান্ধবী কিন্তু আপনার বন্ধু মিঃ আলমের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। আপনারা দু'জন একই চেহারার, একই কণ্ঠে, একই...

চট করে বলে উঠে চঞ্চলা—একই মনের মানুষ। তাই আমি চাই আপনাদের দু'জনের সঙ্গে পরিচিত হতে, বিশেষ করে আরও এক সপ্তাহ যখন আমরা একই জাহাজে আছি।

বনহুর বললো—এটা তো সৌভাগ্যের কথা। আপনাদের মতো সঙ্গী পেলে আমরা ধন্য হবো। জানিনা আমার বন্ধু আলম এতোক্ষণ আসছে না কেন।

চঞ্চলা বললো—নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কাজে তিনি গেছেন বলে মনে হচ্ছে।

বললো বনহুর— হয়তো তাই হবে। অবশ্য সে আমাকে না বলেই গেছে কিনা।

সিমকী বললো—আচ্ছা মিঃ প্রদীপ কুমার, আপনারা মন্থনা দ্বীপেই যাচ্ছেন তো?

হাঁ, মন্থনার মহারাজ আমার পিতা, মহারাণী আমার মাতা, মীরা আমার...বুঝতেই পারছেন আমি সেখানেই যাচ্ছি।

কিন্তু আপনার বন্ধু মিঃ আলম বলেছিলেন মন্থনা দীপ পর্যন্ত নাও যেতে পারি।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো বনহুরের সিকমীর কথায়, বললো—তাই নাকি? আমার বন্ধুর মনে তাহলে অন্য রকম ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু আমি ভাবছি সে গেলো কোথায়? এতোক্ষণও না আসার কারণ কি?

এ কথা সে কথার মধ্য দিয়ে বনহুর নিজকে প্রদীপ কুমার বানিয়ে নিলো, সিমকী বা চঞ্চলা একটু বুঝতে পারলো না যে, সে প্রদীপ কুমার নয়।

নানা রকম গল্পসল্পের পর বিদায় নিলো সিমকী আর চঞ্চলা। বনহুর গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো। প্রদীপ কুমারকে যারা উধাও করেছে তারা যেই হোক এই তরুণী দু'জন তাদের দলে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং প্রদীপ কুমারকে এই জাহাজেরই কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বনহুর এ জাহাজে সন্ধান চালাবে, কাজেই এই তরুণীদ্বয়ের সঙ্গে প্রদীপ কুমারের অভিনয় করে ওদেরকে তার প্রতি নিঃসন্দেহ রাখতে হবে।

বনহুর ক্যাবিনের জানালার ফাঁকে তাকিয়ে রইলো সীমাহীন জলরাশির দিকে। বারবার প্রদীপ কুমারের মুখখানা ভেসে উঠতে লাগলো তার মনের পর্দায়। বেচারার চেহারাটাই হলো তার কাল। পুলিশ মহল তাকে একবার নয়, দু'বার আটক করে কতো নাকানি চুবানি খাওয়ালো। তারপর আবার তার জন্য এলো নতুন বিপদ। প্রদীপ কুমার ভ্রমে সে রেহাই পেলো আর বিপদ এলো প্রদীপ কুমারের জন্য। তাকে রাতের অন্ধকারে ক্লোরফরম করে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু কেন, কি উদ্দেশ্য রয়েছে এর পিছনে? কে সেই নারী যার হাস্যধ্বনি তাকে বিস্মিত করেছে। সিকমী না চঞ্চলার কণ্ঠের সে হাস্যধ্বনি ছিলো? বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে।

কে যেন কাঁধে হাত রাখলো বনহুরের।

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর।

সিমকী দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর বললো—আপনি!

হাঁ, এক্ষুণি গেলাম অথচ পুনরায় ফিরে এলাম। আশ্চর্য হচ্ছেন বুঝি?

না।

জানেন কেন এলাম?

একা একা আছি, তাই আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো হাসি-গল্পে পরিপূর্ণ করতে.....

না, এসেছি একটা কথা বলতে।

বসুন।

এখন নয়, পরে বসবো। শুনুন মিঃ প্রদীপ কুমার।

মিষ্টার বাদ দিয়ে বললেই বেশি খুশি হবো।

আচ্ছা তাই বলবো। দেখুন, আমার বান্ধবী স্বাভাবিক মেয়ে নয়! সে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই এ জাহাজে এসেছে। ওর কথাবার্তা, চাল-চলন আমার মোটেই পছন্দ হয় না। আপনি যতটুকু পারেন ওকে এড়িয়ে চলবেন। সিমকী এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠলো বনহুরের, রহস্যজালটা যেন ক্রমান্বয়ে আরও ঘনীভূত হচ্ছে। বনহুর স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

❑

বনহুর ক্যাবিনের বিছানায় চীৎ হয়ে শুয়ে ভাবছিলো। তাকে বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছিলো প্রদীপ কুমারের বৃদ্ধ বাবা-মা আর স্ত্রী মীরার কথা। তারা বিপুল আগ্রহ নিয়ে ভাবছে ক'দিন পরই আসবে তাদের প্রিয় প্রদীপ কুমার। কতদিন পর তাকে ফিরে পাবে ওরা কিন্তু তা হলো না। মন্থনা দ্বীপে পৌঁছিবার পূর্বেই হারিয়ে গেলো সে আবার এ রকম কোনো বিপদ যাতে না ঘটে, এ জন্যই বনহুর এসেছিলো তাকে নিরাপদে মন্থনায় পৌঁছে দেবে বলে। কে জানতো ওর জন্য এমনি একটা বিপদ ওঁৎ পেতে ছিলো জাহাজ শাহান শাহের মধ্যেও। আছ দু'দিন হলো নিখোঁজ হয়েছে প্রদীপ কুমার। বনহুর গোপনে জাহাজ খানার অনেক জায়গায় সন্ধান করেছে কিন্তু কোথাও প্রদীপ কুমারে চিহ্ন খুঁজে পায়নি। আশ্চর্য, কে বা কারা তার পাশ থেকে প্রদীপ কুমারকে উধারও করলো অথচ সে একটুও টের পায়নি.....

বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো।

কি ভাবছেন প্রদীপ কুমার?

আপনি!

হাঁ এলাম! বললো চঞ্চলা।

বনহুর উঠে বসলো, তাকালো সে চঞ্চলার দিকে। একটা উচ্ছল ভাব ছড়িয়ে আছে তার চোখে মুখে, বললো বনহুর—বসুন।

চঞ্চলা বসলো।

বললো বনহুর—আপনার বান্ধবীকে দেখছিনা তো?

ও আসেনি বলে আপনার বুঝি খারাপ লাগছে?

না না, তা লাগবে কেন। তবে আপনারা দু'জন একসঙ্গে সব সময় জোড়া পাখির মত থাকেন কিনা, তাই.....

আচ্ছা প্রদীপ কুমার?

বলুন?

আপনার বন্ধুর জন্য বড্ড চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাই না?

হাঁ...একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বনহুর, তারপর বলে—জানি না সে কোথা গেলো। যদি তাকে আর খুঁজে না পাই তাহলে আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না।

সত্যি, আপনার বন্ধুর অন্তর্ধানে আমিও দুঃখিত। হঠাৎ তিনি এভাবে নিরুদ্দেশ হলেন.....কথা শেষ না করে চুপ হয়ে যায় চঞ্চলা।

বনহুর কোনো কথা বলে না, সে মুখ নিচু করে কিছু ভাবতে থাকে।

চঞ্চলা বলে—প্রদীপ কুমার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সঠিক জবাব দেবেন?

বলুন, নিশ্চয়ই দেবো।

আপনি আমার বান্ধবী সিমকীকে কাছে পেলে খুশি হন বুঝি?

হাসলো বনহুর, কেনো জবাব সে দিলো না।

চঞ্চলা বলে উঠে—আপনাকে বলতেই হবে, সত্যি আপনি সিম্‌কীকে ভালবাসেন কিনা?

এবার বললো বনহুর—সামান্য দু'চার দিনের পরিচয়। এ জাহাজে আমরা সবাই মুসাফির মাত্র, কাজেই এখানে এ ধরনের কোনো প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছে.....

আপনি বিবাহিতা?

হাঁ।

কি যেন ভাবলো চঞ্চলা, তারপর বললো—সত্যি আপনাকে আমার বড্ড ভাল লাগে।

এ আমার সৌভাগ্য মিস চঞ্চলা।

জানেন আমার বান্ধবী সিম্‌কী কি বলে?

কি বলেন উনি?

আপনি নাকি ওকে ভালবাসেন।

বনহুর মৃদু হাসে।

কই, কথা বলছেন না তো?

কি বলবো?

সিমকী আপনাকে ভালবাসে সত্যি?

হয়তো বাসে, যেমন আপনার ভাল লাগে।

দেখুন প্রদীপ কুমার, ওকে মোটেই বিশ্বাস করবেন না।

কারণ?

কারণ সে সম্পূর্ণ ছলনাময়ী।

মিস চঞ্চলা।

হাঁ প্রদীপ কুমার।

কেন? ভ্রুকুঁচকে জিজ্ঞাসা করলো বনহুর।

চঞ্চলা সরে আসে আরও কাছে—এর পূর্বে সে একজনকে ভালবাসতো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও সে ফাঁকি দিয়েছে। বলুন তো কতো নীচ সে!

বনহুর গম্ভীরভাবে চঞ্চলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো—আপনি কাউকে ভালবাসেননি মিস চঞ্চলা?

বিশ্বাস করুন আমি ভালবাসার মত আজও কাউকে খুঁজে পাইনি।

তাই নাকি?

হাঁ।

বড় আফসোস, আজও আপনি আপনার মনের মত মানুষ খুঁজে পাননি।

কিন্তু আপনাকে আমার বড় ভাল লেগেছে।

বললাম তো এ আমার সৌভাগ্য।

দেখুন আপনিও মন্থনার রাজকুমার আর আমিও ধনকুবের হিমেন্দু নাথের কন্যা। যদিও আপনি বিবাহিতা তবু আমি আপনাকে ভালবাসবো। ভালবাসা অপরাধ নয়.....চলি, কেমন?

আচ্ছা আসুন।

বেরিয়ে যায় চঞ্চলা।

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে ভাবে, এ যে আর একটি রহস্যজালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো সে। চঞ্চলা আর সিমকী এরা দু'বান্ধবী এবং এরা দু'জনই মন্থনা দ্বীপবাসিনী। এরা জানে, সেই মন্থনার রাজকুমার প্রদীপ। প্রদীপ কুমার আর এদের গন্তব্য স্থান হলো একই জায়গায়। বনহুর যেন বিপদে পড়লো, তার অনিচ্ছা সত্বে সে যেন একটা গভীর রহস্যজাল জড়িয়ে পড়ছে।

যখন জাহাজ শাহান শাহ মন্থনা দ্বীপে গিয়ে পৌছবে তখন প্রদীপ কুমারকে নেবার জন্য আসবে তার বাবা-মা, স্ত্রী মীরা কিন্তু কোথায় সেই প্রদীপ কুমার! কে সেই নারী যে তাকে দস্যু বনহুর ভ্রমে হরণ করেছে? কি উদ্দেশ্য আছে বা ছিলো তার?

বনহুর ক্রমে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে।

বেরিয়ে আসে সে বাইরে, ডেকের পাশে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ সমুদ্রে তরঙ্গায়িত জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ নয়নে, তারপর পা বাড়ায় সে সিমকীর ক্যাবিনের দিকে।

সিমকীর ক্যাবিনের নিকটে পৌছতেই ক্যাবিনের মধ্য হস্তে ভেসে আসে অদ্ভুত এক নারীকণ্ঠ। থমকে দাঁড়ায় বনহুর, তাকিয়ে থাকে ক্যাবিনের বন্ধ দরজার দিকে। নারীকণ্ঠ কিন্তু স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন লাগছে। কি বলছে, কে বলছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ পিছনে পদশব্দ হতেই বনহুর আড়ালে আত্মগোপন করলো।

এগিয়ে এলো সিমকী আর চঞ্চল, ওরা দু'জন হাসি-গল্প করতে করতে ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়ালো। বনহুর ঐ মুহূর্তে ক্যাবিনের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তা শুনতে পেলো না।

চঞ্চলা সিমকীর সঙ্গে কথা শেষ করে নিজের ক্যাবিনের দিকে চলে যায়।

সিমকী দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেলো, সে প্রবেশ করলো ভিতরে। চাপাকণ্ঠে কি যেন কথাবার্তা হলো মা ও মেয়ের মধ্যে, বনহুর ঠিক বুঝতে পারলো না।

সে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ক্যাবিনের দরজায়— ভিতরে আসতে পারি?

সিমকীর গলা শোনা গেলো—নিশ্চয়ই, আসুন আসুন।

বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

সিমকী দীপ্ত উজ্জ্বল মুখে অভ্যর্থনা জানালো—প্রদীপ কুমার আপনি!

হাঁ, এলাম আপনার মার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য।

সিমকী হেসে বললে—পরম সৌভাগ্য আমাদের। ক'দিন হতেই আপনাকে বলেছি চলুন আমার মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই কিন্তু আপনি এখন নয় তখন, তখন নয় কাল করে সময় কাটিয়েছেন।

তারপর মাকে লক্ষ্য করে মারাঠা ভাষায় বললো—এসো মা এসো, ইনি হলেন মন্থনার রাজপুত্র প্রদীপ কুমার।

দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বৃদ্ধা।

সিমকী বলে—ইনি আমার মা মিসেস এ্যানিসা।

বনহুর ওকে ঠিক বৃদ্ধার অনুকরণে প্রণাম জানালো, তারপর হেসে বললো—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অনেক খুশি হলাম।

সিমকী বললো—আমার মা ইংরেজি জানে না, কাজেই সে আপনার কথা মোটেই বুঝতে পারছে না। ধন্যবাদ, আমি আমার মাকে আপনার কথাটা বুঝিয়ে বলছি।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো সিমকীর মার মুখে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি। সে যেন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

সিমকী মারাঠা ভাষায় তার মাকে বনহুরের কথাটা বুঝিয়ে বললো। ওর মার মুখ হাস্যোদীপ্ত হয়ে উঠলো। সেও মারাঠা ভাষায় কিছু বললো।

বনহুর তার এক বর্ণও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলো না। কারণ সে মারাঠা ভাষার সঙ্গে মোটেই পরিচিত ছিলো না।

সিমকী মায়ের কথাগুলো বুঝিয়ে বলে, কতকটা দোভাষীর কাজ করে সে।

কিছু সময় কাটে তাদের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে, এক সময় বিদায় নেবার জন্য বনহুর উঠে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধা কিছু বললো!

সিমকী বুঝিয়ে দিলো—প্রদীপ কুমার, আপনাকে দেখে আমার মা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। এই জাহাজে না এলে আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হতো না। আপনি আবার আশা করি আসবেন।

বনহুর বললো—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি নিজেও কম আনন্দিত হইনি। নিশ্চয়ই আবার আসবো।

তখনকার মত বিদায় গ্রহণ করে বনহুর সিমকীর ক্যাবিন থেকে।

ফিরে এলো সে ক্যাবিনে কিন্তু তার মন জুড়ে বিরাট একটা রহস্যময় চিন্তা ঘুরপাক করতে লাগলো।

এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো সাগরের বুকে।

ক্যাবিনখানার মধ্যেও সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাপসা হয়ে এসেছে। বনহুর সিগারেট পান করতে করতে পায়চারী করছে আর চিন্তা করছে কিছু পূর্বে সিমকীর মায়ের ক্যাবিন থেকে যে নারী কণ্ঠ তার কানে এসেছিলো তারই কথা। অদ্ভুত সে নারীকণ্ঠ ছিলো, নিশ্চয়ই কোনো মেশিনের সাহায্যে সে শব্দ দূরে পাঠানো হচ্ছে বা দূর দেশের কোথাও হতে জাহাজের ঐ ক্যাবিনে আসছে। সিমকীর মা বৃদ্ধা যে গলার সুর সে শুনেছে সে স্বর তার নয়। সে মুহূর্তে সিমকীও ছিলো না ক্যাবিনের ভিতরে। তবে কি ব্যাপার.....

বনহুর গভীরভাবে ভাবছে, ঐ সময় আধো অন্ধকারে এসে দাঁড়ায় একটি ছায়ামূর্তি তার ক্যাবিনে।

বনহুর ফিরে তাকিয়ে বলে উঠে—কে?

আমি সিমকী।

ও।

কই, ভিতরে আসতে বলছেন না তো?

এই তো এসেছেন।

অন্ধকারে কেন?

ও তাই তো.....বনহুর সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই সিমকী ওর হাতখানা ধরে ফেলে—না থাক।

বনহুর অবাক হয়।

সিমকী বলে—অন্ধকার বেশ লাগছে।

কিন্তু.....

যদি কেউ এসে পড়ে, এই তো?

তা তো নিশ্চয়ই, কারণ আপনি নারী আমি পুরুষ, আমার ক্যাবিনে আপনাকে এই অন্ধকারে দেখলে সবাই.....

আঁতকে উঠবে, না?

ঠিক আঁতকে নয়।

তবে?

কতকটা বিস্মিত হবে বলতে পারেন।

এ আপনার মনের দুর্বলতা।

হয়তো তাই।

প্রদীপ কুমার।

বলুন?

আপনার অনুমতি পেলে বসতে পারি।

নিশ্চয়ই বসুন, তবে আমার মনে হয় আলোটা জ্বালালে ভাল হয়। আপনার মাও তো এসে পড়তে পারেন?

ও আপনাকে ভাবতে হবে না। সিমকী আসন গ্রহণ করতে করতে কথাটা বলে।

বনহুরও আর একটি আসনে বসে পড়ে কতকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও। হঠাৎ অসময়ে সিমকীর আগমন তার মোটেই পছন্দ হয়নি, তবু মনোভাব গোপন রেখে বলে—আপনার মা খুব ভাল।

দেখুন মাও কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অনেক ভাল বললেন। মাকে যাই মনে করুন মা কিন্তু আসলে বড্ড লোভী।

তার মানে?

মানে আপনি রাজকুমার তারপর বিবাহিত তবু আমার মায়ের লোভ পড়েছে আপনার উপর, যা কোনোদিন আমাদের মত মেয়ে আশাই করতে পারে না। জানেন মা কি বলেছে আপনার সম্বন্ধে?

কি বলেছেন?

যদি আপনার মত একটি ছেলে সে জামাই হিসেবে পেতো।

ও, এই তাঁর লোভ? হাসে বনহুর।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বনহুরের হাসির শব্দ ক্যাবিনটাকে মনোরম করে তোলে।

সিমকী অভিভূত হয়ে পড়ে।

বলে সিমকী—মার বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর লোভ...সত্যি যা কোনোদিন সম্ভব নয় তাই সে আশা করে।

মিস সিমকী, আমার চেয়েও সুন্দর এবং গুণবান জামাই আপনার মা পেতে পারেন, কাজেই আশা করাটা তার পক্ষে অসম্ভব নয় মোটেই।

কিন্তু আমি জানি কোনোদিন সে আশা পূরণ হবে না! প্রদীপ কুমার, ভালবাসা কি পাপ? আমি যদি আপনাকে ভালবাসি তা কি অন্যায় হবে?

না।

সত্যি বলছেন?

সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার।

কিন্তু আপনি?

একটু হাসির শব্দ শোনা গেলো, বললো বনহুর—মাত্র ক'দিনের পরিচয়, এর মধ্যে আপনি আর আমি কতটুকু ঘনিষ্ঠতা লাভ করতে পারি? হয়তো এরপর আর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ নাও ঘটতে পারে।

যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে সবই সম্ভব। প্রদীপ কুমার, সত্যি আপনার জন্য আমি নিজকে উজাড় করে দিতে পারি। আপনি কি আমার জন্য একটুও আপনার ভালবাসা দিতে পারেন না?

এর জবাব আজ নয়, আর একদিন দেবো মিস সিমকী।

সত্যি, আপনিই এক পুরুষ যাকে আমি নতুন করে আবিষ্কার করলাম। কোনো লোভ মোহ নেই আপনার মধ্যে। অদ্ভুত মানুষ আপনি।

সিমকী কথাগুলো বলে নিজেই সুইচ টিপে আলো জ্বালালো!

বনহুর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললো—চলুন ডেকে গিয়ে দাঁড়াই।

সিমকী বললো—চলুন।

বনহুর আর সিমকী ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় জাহাজের ডেকে রেলিংয়ের পাশে।

এ দিকটায় তেমন কোনো লোকজন ছিলো না। বেশ নিরিবিলি। খানিক দূরে কয়েকজন যাত্রী নারীপুরষ ডেকের ধারে বসে বসে হাসিগল্প করছিলো।

বনহুর আপন মনে সিগারেট থেকে ধূম্র নির্গত করে চলেছে।

সিমকী বললো—আচ্ছা প্রদীপ কুমার, আপনার বন্ধু আলমের নিরুদ্দেশ সংবাদ ক্যাপ্টেনকে জানিয়েছেন কি?

বনহুর সিমকীর মুখে তাকালো, বললো—না; প্রয়োজন মনে করিনি।

প্রদীপ কুমার, আপনি কি বন্ধুর জন্য চিন্তিত হননি?

নিশ্চয়ই হয়েছি।

তাহলে কি করে নিশ্চুপ রইলেন?

জানি তাকে খুঁজে পাবো না।

আচ্ছা প্রদীপ কুমার, আপনি মনে করেন আপনার বন্ধু আলম এ জাহাজে নেই?

এ ব্যাপারে আপনি যেমন ভাবছেন আমিও ঠিক তেমনি ভাবছি।

দেখুন আপনাকে দেখে মনে হয় বন্ধুর জন্য আপনি মোটেই চিন্তিত নন।

এ কথা সত্যিই, কারণ বন্ধুর জন্য চিন্তা করে কোনো ফল হবে না, তাই.....

সত্যি আপনি আমাকে হাসালেন, কেউ কোনোদিন এমন কথা বলে না।

চলুন মিস সিমকী ঐ ভদ্রলোকদের সঙ্গে বসে আলাপ করিগে।

কেন, এখানে বুঝি ভাল লাগছে না আপনার?

তা লাগছে বইকি কিন্তু ওদের সঙ্গে বসে আলাপ করলে মন্দ কি?

ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আপনার?

জাহাজে আসার পর যাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে কিন্তু আপনার মত অন্তরঙ্গতা হয়নি কারো সঙ্গে।

এমন সময় ৮নং ক্যাবিনের যাত্রী দু'জন এসে দাঁড়ায়, ওরা স্বামী-স্ত্রী মিঃ আর এ চৌধুরী ও তার স্ত্রী মিসেস চৌধুরী।

মিঃ চৌধুরী আর মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো বনহুরের জাহাজে আসার তৃতীয় দিনে। ভদ্রলোক ভারি অমায়িক লোক। তেমনি তার স্ত্রী মিসেস চৌধুরী জাহাজের প্রথম ক্লাসের ৮নং ক্যাবিনের যাত্রী তাঁরা, তাই পায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিলো ৩নং ক্যাবিনের প্রদীপ কুমারের সঙ্গে। প্রদীপ কুমার মন্থনার রাজপুত্র, এ কথা জানার পর জাহাজের অনেকেই পায়ে পড়ে আলাপ করতে আসতো কিন্তু প্রদীপ কুমার তখন উধাও হয়েছে। কাজেই বনহুরকে প্রদীপ কুমারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে।

মিসেস চৌধুরী বনহুর আর সিমকীকে লক্ষ্য করে বললেন—বাঃ চমৎকার জুটি বনে গেছেন! সন্ধ্যার সমুদ্র উপভোগ করছেন বুঝি?

বনহুর হেসে বলে—হাঁ, কতকটা তাই।

মিঃ চৌধুরী বললেন—কুমার বাহাদুর, আপনার সঙ্গিনীটি নিশ্চয়ই বাঙ্গালি বলে মনে হচ্ছে না? কিন্তু...

বনহুর সিমকীর মুখে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—আপনাদের অনুমান মিথ্যা নয়, আমার সঙ্গিনী মারাঠী মেয়ে কিন্তু আপনারা যা মনে করেছেন তা নয়।

মিসেস চৌধুরী বললেন—তাহলে?

জাহাজেই সঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছি.....

ও তাই বলুন, উনি তাহলে মন্থনার রাজপুত্রবধু নন,—বললেন মিঃ চৌধুরী।

না। বললো বনহুর।

মিসেস চৌধুরী যেন এতোক্ষণে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। এ ক'দিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এদের দু'জনাকে নিয়ে নানারকম তর্ক-বিতর্ক চলছে। স্বামী বলেন, রাজকুমারের স্ত্রী ঐ মেয়েটি আর মিসেস চৌধুরী বলেন, না তা নয়, ঐ মেয়েটি প্রদীপ কুমারের স্ত্রী হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এগিয়ে এসেছেন নিজ নিজ সন্দেহের সমাধান করতে।

মিসেস চৌধুরী জিতে বললেন—দেখলে কে জিতে গেলো। আমি ঠিক বলেছি না, ও মেয়েটি প্রদীপ কুমারের স্ত্রী হতে পারে না কখনও...

মিঃ চৌধুরী বললেন—বেশ, স্ত্রী না হলেও হবে তো একদিন। আমি ঠিক বলেছি কিনা উনাকে জিজ্ঞাসা করো। আচ্ছা প্রদীপ কুমার, জাহাজের সঙ্গিনী হলেও ওকে আপনি ভাবী স্ত্রী বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন তো?

বনহুর এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—মিঃ চৌধুরী, আপনি পরাজিত হয়েছেন আপনার স্ত্রীর কাছে, কারণ আমি বিবাহিত। কাজেই এ ধরনের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

এবার মিঃ চৌধুরীর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো, তিনি আড়নয়নে স্ত্রীর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই মিসেস চৌধুরী বললেন—দেখলে তো কার জিত হলো? এবার চলো।

মিঃ চৌধুরী ও মিসেস চৌধুরী চলে গেলেন।

বনহুর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মিস সিমকী এতোক্ষণ হা করে ওদের কথাবার্তা শুনছিলো, এবার বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—উনারা কি বলছিলেন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে?

ও! ওঁরা বলছিলেন তরুণী আপনার কে হন?

আপনি কি বললেন?

বললাম আমার বোন হন উনি।

সিমকী এতে তেমন খুশি হলো বলে মনে হলো না বরং মুখটা একটু গম্ভীর হলো।

বনহুর বললো—মিস সিমকী, সত্যি বলতে কি আমার বোন নেই, আপনি যদি আমার বোন হতেন এবং সব সময় আপনি আমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসতেন তাহলে কত না খুশি হতাম।

সিমকী গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো, তারপর বললো—বেশ, তাই হোক।

হাঁ, আপনি আমাকে ভাই বলে ডাকবেন, আর আমি আপনাকে ছোট বোন বলে গ্রহণ করবো।

আচ্ছা, সেই ভাল।

সিমকী বিষণ্ণ মুখে ফিরে যায় তার নিজের ক্যাবিনের দিকে।

বনহুর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো এতোক্ষণে।

সিমকী চলে যেতেই একটি নারীমূর্তি বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে।

চমকে না উঠলেও একটু হকচকিয়ে গেলো বনহুর, কারণ মেয়েটি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে। মেয়েটির মুখে আলো পড়তেই বনহুর তাকে চিনতে পারলো সে চঞ্চলা। বনহুর কিছু বলবার পূর্বে চঞ্চলা বললো—প্রদীপ কুমার, সত্যি আপনি ওকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলেন।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো চঞ্চলার দিকে।

চঞ্চলা বললো আবার—কই, জবাব দিচ্ছেন না যে?

বললো বনহুর—আপনার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অহেতুক, তাই।

মানে?

মানে তাকে আমি ফিরিয়ে দেইনি বরং তাকে বোনের মর্যাদা দিয়েছি।

সত্যি আপনি অদ্ভুত মানুষ।

কতকটা তাই।

প্রদীপ কুমার, আমি জানতাম আপনি সিমকী মেয়েটাকে ভালবাসতে পারেন না।

ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকায় বনহুর চঞ্চলার দিকে— কেন?

তা আপনি নিজেই জানেন। যাক সে কথা, কেন এলাম এবার বলি।

বলুন?

কিন্তু কথাটা অত্যন্ত গোপনীয়।

আমি গোপনতা রক্ষা করবো।

যা বলবো তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আপনার কাছে। কিন্তু একটি শর্ত আছে।

বলুন কি শর্ত?

ঠিক আপনি আমার কথামতো কাজ করবেন?

যদি আমার রুচিমতো হয় নিশ্চয়ই করবো।

প্রথমে কথা হলো সিমকীর সঙ্গে আপনি প্রেমের অভিনয় করবেন এবং ঘন ঘন যাবেন তাদের ক্যাবিনে!

তারপর?

আপনি জানতে পারবেন কে সিমকী আর কে তার মা.....

হঠাৎ বুকে হাতচাপ দিয়ে আর্তনাদ করে উঠে চঞ্চলা, সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ে যায়।

বনহুর ওকে ধরে ফেলতেই দেখতে পায় চঞ্চলার পিঠে বিদ্ধ হয়ে আছে একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা। ছোরাখানা যে কখন এসে বিদ্ধ হলো, টেরই পায়নি বনহুর।

চঞ্চলার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে অদূরে ডেকের ধারে বসে গল্পেরত যাত্রীদল শশব্যস্তে ছুটে আসে সবাই। ঘিরে দাঁড়ায় বনহুর আর চঞ্চলাকে।

তখন বনহুরের হাতের উপর ঢলে পড়েছে চঞ্চলার দেহখানা। পিঠ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে বনহুরের হাত দুটো ভিজে জপজপে হয়ে উঠেছে।

সবাই এই দৃশ্য লক্ষ্য করে হতভম্ব হয়ে গেলো যেন।

কারো মুখে কোনো কথা সরছে না।

বনহুর ডাকলো, মিস চঞ্চলা, একি হলো! কে আপনাকে এভাবে ছোরাবিদ্ধ করলো? বলুন, বলুন মিস চঞ্চলা?

চঞ্চলার মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠে কিন্তু কোনো কথা বলতে পারে না। মাথাটা ঢলে পড়ে বনহুরের বুকের একপাশে।

বনহুর ওকে শুইয়ে দেয় ডেকের উপর এবং শুইয়ে দেবার পূর্বে তার পিঠ থেকে ছোরাখানা অপর একজনকে তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

ততোক্ষণে সিমকী আর তার মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পড়ে সেখানে, উভয়ের চোখে উত্তেজনার ছাপ। তারা ব্যস্ত এবং ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—কে একে এভাবে হত্যা করলো?

বনহুর একবার তাকালো ওদের দু'জনার মুখের দিকে, কোনো জবাব সে দিলো না।

অল্পক্ষণে ক্যাপ্টেন এবং জাহাজের অন্যান্য কর্মচারী ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছে। সকলের চোখেমুখে ভীতি ও উত্তেজনার ছাপ।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কি রাজকুমার? একি কান্ড হলো?

বনহুর ক্যাপ্টেনকে বললো—আমি সম্পূর্ণ এ ব্যাপারে অজ্ঞ। আমরা দু'জন ডেকের ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, হঠাৎ সেই মুহূর্তে কোথা হতে এর পিঠে ছোরা এসে বিদ্ধ হলো আমি কিছু বলতে পারলাম না।

জাহাজে এ ব্যাপার নিয়ে ভীষণ একটা চঞ্চল এবং ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। সমস্ত জাহাজে তল্লাশি চালিয়েও এর কোনো ক্লু আবিষ্কার হলো না।

মৃতদেহ একটি ক্যাবিনে বরফ দিয়ে রাখা হলো, কারণ মন্থনায় না পৌঁছানো অবধি এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হলো না।

বনহুর ছোরাখানা সবার অলক্ষ্যে সরিয়ে ফেলেছিলো, সে ক্যাবিনে গিয়ে ছোরাখানা তুলে ধরলো চোখের সামনে। এ সেই একই ধরণের ছোরা যে ছোরা ক'দিন পূর্বে তার পায়ের কাছে গেঁথে গিয়েছিলো, যে ছোরার বাটে গাঁথা ছিলো একটি ছোট্ট চিঠি। যে বনহুর ভ্রমে প্রদীপ কুমারকে সরিয়ে নিয়েছে, সে-ই চঞ্চলার হত্যাকারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রদীপ

কুমারের হরণকারী এবং চঞ্চলার হত্যাকারী যে এ জাহাজেই আত্মগোপন করে আছে তা সঠিক বুঝতে পারলো বনহুর।

ছোরা দু'খানা সে তার বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখলো, তারপর ফিরে দাঁড়াতেই একটি নারীকণ্ঠের অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো ক্যাবিনের মধ্যে।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সম্মুখের শার্শী দিয়ে জাহাজের ডেকে। অদ্ভুত এ নারী, যে তার চোখেও ধুলো দিয়ে জাহাজেই লুকিয়ে আছে কিন্তু কে সে?

বনহুর আপন মনে পায়চারী করে চললো। ভাবছে বনহুর, চঞ্চলাকেই তার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিলো, হয়তো ছোরা নিক্ষেপকারিণী সেই হবে কিন্তু আসলে সে নয়, তবে কে সেই নারী.....

বনহুর পায়চারী করতে লাগলো।

নারীকণ্ঠের অট্টহাসির শব্দটা যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। আজ পর্যন্ত এমন কোনো নারী বা পুরুষ নেই যে, তার চোখকে ফাঁকি দিয়েছে। কে এই অট্টহাসির অধিনায়িকা যে বনহুর ভ্রমে প্রদীপ কুমারকে উধাও করলো এবং বেচারী চঞ্চলাকে হত্যা করলো? নিশ্চয়ই চঞ্চলা তাকে এমন কিছু বলতে যাচ্ছিলো যা বলবার পূর্বেই তাকে নিঃশেষ করা হলো। সিমকী আর তার মা, কে এরা? সত্যি কি এরা মারাঠা জাতি?

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে।

তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে চঞ্চলার মুখখানা। কি নির্মম সে মুহূর্তটা। চঞ্চলা ভাবতেও পারেনি কয়েক সেকেন্ড পর সে এ পৃথিবীতে আর থাকবে না। বরফের চাপের নিচে রাখা হয়েছে ওকে কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেও সে গরম গরম কাপড় শরীরে ধারণ করেছিলো। বনহুর ভাবছে কত কথা, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সেই কি দায়ী.....

ঐ মুহূর্তে একটি ছায়ামূর্তি সরে গেলো জানালার পাশ থেকে। বনহুর বেশ বুঝতে পারলো ছায়ামূর্তি কোনো নারী, পুরুষ নয়। বনহুর দ্রুত জানালার পাশে এসে উঁকি দিলো গলা বাড়িয়ে। স্পষ্ট দেখতে পেলো ছায়ামূর্তিটা দ্রুত চলে গেলো ক্যাপ্টেনের কামরার দিকে।

বনহুর কিছুক্ষণ ভাবলো এখন তার কি করা কর্তব্য। ছায়া-মূর্তিটাকে ফলো করে কোনো লাভ হবে কি? না, এ মুহূর্তে নয়।

ফিরে আসে বনহুর নিজের আসনের পাশে।

❑

সমস্ত রাত বনহুর গোপনে সন্ধান করে চলে যেখানে যেখানে এবং যাকে যাকে তার সন্দেহ হয়েছিলো। সবশেষে সিমকীর ক্যাবিনের পাশে এসে দাঁড়ায়। ক্যাবিনের মধ্যে কোনো সাড়াশব্দ নেই। এক মিনিট দু'মিনিট করে কাটে দু' ঘন্টা। না, ভিতর থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

বনহুর এমন জায়গায় আত্মগোপন করে আছে যেখানে কারো নজর পড়বে না। তবু বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে এগিয়ে যায় বনহুর সেই ক্যাবিনটার দিকে, যে ক্যাবিনে চঞ্চলার মৃতদেহ বরফচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

ক্যাবিনটার পাশে এসে দাঁড়াতেই বনহুরের বুকটা নিজের অজান্তে দুলে উঠলো। চঞ্চলাকে সে ভুল বুঝেছিলো, কেমন যেন সন্দেহ এসেছিলো ওর উপর কিন্তু আসলেই কি চঞ্চলা সন্দেহহীনা ছিলো? যদি সে সম্পূর্ণ নির্দোষ হবে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে কেন? কে এই চঞ্চলা যার মধ্যে লুকোন ছিলো কোনো একটা গোপন রহস্য। বনহুর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে এ ক্যাবিনে কোনো সাড়া পাওয়া যায় কিনা।

না, বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও কোনো শব্দ সেই ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো না। মৃত ব্যক্তি তো আর কথাও বলবে না বা হেঁটেও বেড়াবে না, তবে কিসের শব্দের প্রতীক্ষা করছিলো বনহুর সে নিজেই জানে।

বনহুর নিজের ক্যাবিনে ফিরে আসবার জন্য পা বাড়ালো। তাকে সিমকীদের ক্যাবিনের সম্মুখ হয়েই আসতে হবেই।

যেমনি বনহুর সিমকীদের ক্যাবিনের সম্মুখে এসেছে অমনি একটা শব্দ তার কানে এলো, সেই অদ্ভুত নারীকণ্ঠ। কেমন যেন কথাগুলো অস্পষ্ট ধরনের।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে চট্ করে ক্যাবিনের পিছনে এসে একটি থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। কান পাতে সে ক্যাবিনের পাশে। ক্যাবিনের মধ্যে জমাট অন্ধকার। পাশেই জানালা, কিঞ্চিৎ ফাঁক থাকা সত্বেও ক্যাবিনের ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না! অতি চেষ্টা করেও বনহুর শব্দগুলোর এক বর্ণও বুঝতে পারলো না।

কণ্ঠ সিমকীর নয়, এতে কোনো ভুল নেই। তবে সিমকীর মায়ের কণ্ঠ বলেও মনে হলো না। বনহুর ফিরে এলো ক্যাবিনে, সে বুঝতে পেরেছে, ঐ শব্দটা কোনো ওয়্যারলেসে দূর থেকে ভেসে আসা নারী কণ্ঠস্বর।

বনহুর নিজকে প্রস্তুত করে নিলো। তাকে এই গভীর রহস্যের সমাধান করতেই হবে। আজ মনে পড়লো কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। এবার কান্দাই ফিরে একটি দিনের জন্য সে বিশ্রাম গ্রহণ করবার সুযোগ পায়নি। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা বিভীষিকাময় অবস্থা বিরাজ করছিলো। চারিদিকে অন্যায়-অনাচার-অবিচার-শোষণ-নিষ্পেষণ চলছিলো। জনগণ এক চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছিলো। এ কারণে তাকে অক্লান্ত চেষ্টা চালাতে হয়েছে। একদল নরপশুর নির্মম আচরণে জনগণ হাঁপিয়ে উঠেছিলো, তাদেরকে দমন করতে হয়েছে তাকে। তার প্রচেষ্টা বিফল হয়নি, চোরাচালানী দল সম্পূর্ণ বিনাশ না হলেও সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। কান্দাইবাসীদের মনে ফিরে এসেছে শান্তি আর আনন্দ। তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি দেশবাসী, কারণ এখনও দেশের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে অনেকগুলো নেত্রীস্থানীয় নরপশু, যারা সরকারের সহকারী হিসেবে দেশবাসীর মঙ্গলের অভিনয়ের আড়ালে করে চলেছে তাদের সর্বনাশ।

বনহুর এদের সন্ধান জানলেও তাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেনি, কারণ সময় ছিলো না তার হাতে। প্রদীপ কুমারের বন্দী জীবন তাকে বেশ করে ভাবিয়ে তুলেছিলো। একবার নয়, দু' দু'বার বেচারা প্রদীপ শুধু তারই জন্য নাকানি-চুবানি খেয়েছে বা খাচ্ছে। একটা নিরীহ মানুষ কারাগারের কঠিন শাস্তি পেতে থাকবে আর সে আরামে দিন কাটাবে, তা হতে পারে না।

বনহুর তাই প্রদীপ কুমারের উদ্ধার ব্যাপার নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলো। প্রদীপ কুমারের মুক্তি তাকে শুধু আনন্দই দেয়নি, তার মনে এনে দিয়েছিলো একটা শান্তি, একটা নিশ্চিন্ত ভাব। বনহুর তাই রহমানের কাছে বিদায় নিয়েই রওয়ানা দিয়েছিলো প্রদীপ কুমারের সঙ্গে, পথে যেন তার আর কোনো বিপদ না আসে। বেচারার জন্য আজ তাই বেশি করে ভাবনায় পড়েছে বনহুর। কোথায় আছে সে আর কি অবস্থাতেই বা আছে কে জানে!

বনহুর সমস্ত জাহাজখানা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু প্রদীপ কুমারকে সে খুঁজে পায়নি। বড় আশ্চর্য লাগছে বনহুরের কাছে। এমনভাবে তার পরাজয় কোনোদিনই হয়নি।

কিন্তু তাকে অসীম ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করতে হবে যতোক্ষণ না জাহাজখানা মন্থনা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছে। পুরো তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, এখন মাত্র কয়েকটা দিন। এই কয়েকটা দিন কেমনভাবে কাটবে কে জানে।

চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় বনহুর। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতেই পারে না সে। হঠাৎ গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। কেমন যেন একটা নীলাভ আলোকরশ্মি তার ক্যাবিনের জানালার পথে এসে পড়েছে ক্যাবিনের দেয়ালে। বনহুর দ্রুত তার শয্যা ত্যাগ করে ক্যাবিনের জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। জানালা বন্ধ ছিলো, তাই বনহুর জানালার শার্শীর ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ক্যাবিনের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো আপন মনে—উড়ন্ত যান! একটি ছোট্ট উড়ন্ত যান দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের ডেকে ঠিক সিমকীদের ক্যাবিনের সম্মুখে। উড়ন্ত যান থেকে নীলাভ আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে।

সিমকীদের ক্যাবিনের দরজা খোলা বলে মনে হলো। ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো সিমকীর মা।

বনহুর লক্ষ্য করছে।

সিমকীও এসে দাঁড়ালো মায়ের পিছনে।

উড়ন্ত যানটির সম্মুখে এসে সিমকীর মা সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে খসে পড়লো বৃদ্ধার ড্রেস। বনহুরের দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ে। সিমকীর মার অদ্ভুত পরিবর্তন। আসলে সে বৃদ্ধ নয়, এক অপূর্ব সুন্দরী নারী বৃদ্ধার ড্রেসের নিচে ছিলো। অদ্ভুত এক ড্রেস।

সিমকীর মা উড়ন্ত যানের দিকে এগুলো।

সিমকী নত হয়ে তাকে অভিবাদন করলো।

সিমকীর মা উড়ন্ত যানে উঠে পড়তেই যানটি ভেসে উঠলো আকাশে, তারপর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বনহুর ফিরে এলো তার বিছানার পাশে, কিন্তু শয্যা গ্রহণ করতে সে পারলো না। পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগলো কেন জাহাজের মধ্যে

কোনো জায়গায় প্রদীপের অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি। ঐ উড়ন্ত যানে করেই তাকে জাহাজ শাহান শাহ থেকে সরানো হয়েছে। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে? কে এই সিমকী আর সিমকীর মায়ের বেশেই বা কে সেই নারী, যে নারী আজ উড়ন্ত যানে শাহান শাহ ত্যাগ করলো?

সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটলো বনহুরের।

ভোরে সোফায় হেলান দিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে ক্যাবিনে প্রবেশ করে ক্যাপটেন, তার পিছনে সিমকী।

বনহুরের নিদ্রা ছুটে যায়, সে দড়বড় করে উঠে দাঁড়ায়, চোখেমুখে বিস্ময় টেনে তাকায় সে ক্যাপটেন এবং পর মুহূর্তে সিমকীর মুখে।

ক্যাপটেন ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠে—রাজকুমার, আজ আবার এক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনা!

হাঁ, জানি না জাহাজে কি হলো। সেদিন আপনার বন্ধু হঠাৎ ক্যাবিন থেকে উধাও হলো। তারপর শাহান শাহের অন্য ক্যাবিনের যাত্রী মিস চঞ্চলার অকস্মাৎ মৃত্যু। আজ আবার মিস সিমকীর মায়ের নিরুদ্দেশ.....

ক্যাপটেনের কথা শেষ হয় না, তাকায় বনহুর পুনরায় সিমকীর মুখে। সিমকী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো কিন্তু দু'চোখে তার একটা দ্যুতি খেলে গেলো, বললো—মিস সিমকীর মা নিরুদ্দেশ, বলেন কি ক্যাপেটেন?

হাঁ, সমস্ত জাহাজে তল্লাশি চালিয়েও তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। ক্যাপটেনের গলায় হতাশার সুর।

সিমকী একটা চেয়ারে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বনহুর মনে মনে হাসছে সিমকীর অভিনয় অভিজ্ঞতা তাকে অভিভূত করলো। দুঃখভরা কণ্ঠে বললো—মিস সিমকী, সত্যি আমরা সবাই দুঃখিত। হঠাৎ আপনার মা এমনভাবে নিরুদ্দেশ হবেন, আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি। আমার বন্ধুর জন্যও ঠিক আপনার মতই আমার মনের অবস্থা কিন্তু কি করবো বলুন, ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কি উপায় আছে। একটু থেমে ক্যাপটেনকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর —আপনি বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে এই অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করুন।

ক্যাপটেন বললো—আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি রাজকুমার কিন্তু সব যেন কেমন রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে। জানি না কেন এমন হলো। ক্যাপটেন কথাগুলো বলে যেমন ব্যস্তভাবে এসেছিলো তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সিমকী তখনও তেমনি বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বনহুর মৃদু হাসে।

এগিয়ে আসে সে সিমকীর পাশে, ওর কাঁধে হাত রেখে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে—মিস সিমকী, আপনি চিন্তা করবেন না, আমার মনে হয় আপনার মা ঠিকই জীবিত আছেন, হয়তো ভালভাবেই আছেন।

সিমকীর কান্না যেন বেড়ে যায়, সে বনহুরের হাতখানা টেনে নেয় দু'হাতের মুঠায়, তারপর বলে—প্রদীপ কুমার, আমি এখন কি করবো বলুন? আমার মা ছাড়া আমি একটি দিনও থাকতে পারি না। কি করবো বলুন?

মিস সিমকী, আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। মন্থনায় না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গে আছি এবং থাকবো।

সত্যি আপনি মহৎ ব্যক্তি।

মিস সিমকী, আপনার মায়ের জন্য আমি সন্ধান করবো।

সিমকীর মুখখানা কিছুটা প্রসন্ন হয়ে উঠে। সে উঠে দাঁড়ায়। বনহুরের হাতখানা তখনও তার হাতের মুঠায়, বলে সিমকী—আপনি আছেন বলেই আমি সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি প্রদীপ কুমার, নাহলে সত্যি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতাম।

তা কি করে ভাবতে পারলেন মিস সিমকী। মা বুড়ো হলে এক দিন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এটা ঠিক। তিনি না মরে উধাও হয়েছেন তাতে ভেংগে পড়ছেন কেন। চলুন আপনাকে ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সিমকী রুমালে চোখ মুছে উঠে পা বাড়ালো।

বনহুর এগিয়ে চললো ওর পাশে পাশে। ক্যাবিনে পৌঁছে বললো সিমকী—বসবেন না একটু।

আপনি যদি খুশি হন নিশ্চয়ই বসবো।

বসুন। বললো সিমকী।

বনহুর বসলো।

সিমকী বললো—রাতে আমার মা আমার পাশেই ঘুমিয়ে ছিলেন।

বনহুর বললো—ঠিক আমার বন্ধুর উধাও ব্যাপারের সঙ্গে আপনার মায়ের উধাও ব্যাপারটা যেন একই সঙ্গে জড়িত।

একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে সিমকী—হয়তো তাই হবে। প্রদীপ কুমার?

বলুন?

সত্যি মাকে আর কোনোদিন দেখতে পাবো না?

নিশ্চয়ই পাবেন।

আপনি ঠিক বলছেন?

মনে হয় পাবেন।

আপনার কথা যেন সত্য হয় প্রদীপ কুমার।

বনহুর বহু নারীকে দেখেছে কিন্তু সিমকীর মত অভিনয় দক্ষ নারী সে কমই দেখেছে। বনহুর মনে মনে হাসলেও মুখোভাবে সে সম্পূর্ণ না জানার এবং না বোঝার ভান করে চললো।

❑

জাহাজ মন্থনায় পৌঁছবার পূর্বদিন রাতে বনহুর ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লো। কাল যখন বন্দরে জাহাজ ভিড়বে তখন রাজপুত্র প্রদীপ কুমারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এগিয়ে নিতে আসবে তার বাবা-মা স্ত্রী মীরা দেবী কিন্তু তখন সে কি করে অভিনয় করবে প্রদীপ কুমারের। না-না, তা হয় না, প্রদীপের বৃদ্ধ পিতামাতা এবং স্ত্রীকে সে ধোকা দিতে পারবে না। তবে কি সে স্পষ্ট বলবে আমি তোমাদের ছেলে প্রদীপ নই। তা বললে হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কিংবা পুত্রশোকে কোনো অঘটন ঘটতে পারে। তবু পারবে না সে এতোবড় মিথ্যা অভিনয় করতে।

হারিয়ে গেছে প্রদীপ কুমার, সেও হারিয়ে যাবে সবার অলক্ষ্যে জাহাজ শাহান শা থেকে।

সত্যিই পরদিন ভোরে বনহুরের ক্যাবিন শূন্য। সমস্ত জাহাজে ভীষণ একটা আলোড়ন শুরু হলো। রাজকুমার প্রদীপ গেলো কোথায়?

কে দেবে তার জবাব?

সিমকী তো মাথায় হাত দিয়ে ক্যাবিনের মেঝেতে বসে পড়লো। তার মুখে কোনো কথা নেই, সে যেন সম্পূর্ণ বোবা বনে গেছে। মিঃ আলম কিভাবে উধাও হয়েছে, কোথায় আছে, কেমন আছে, সব জানে সে তার মা কোথায় গেছে তাও তার অজানা নেই কিন্তু প্রদীপ কুমার গেলো কোথায়? সত্যিই সে উবে গেছে যেন।

সিমকী নিজে সন্ধান করলো সমস্ত জাহাজের সব জায়গায় কিন্তু কোথাও সে তাকে খুঁজে পেলো না।

ক্যাপ্টেন সিমকীকে সান্তনা দিতে লাগলো।

সিমকী জানালো, প্রদীপ কুমারই ছিলো তার ভরসা। মাকে হারিয়ে সে যতো ব্যথা না পেয়েছিলো তার চেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছিলো প্রদীপ কুমারের নিরুদ্দেশ ব্যাপারে।

বৃদ্ধ সারেঙ্গ আওরঙ্গও খবর শুনে এসে হাজির। সিমকীকে সে নিজের মেয়ের মতো মনে করতো। একদিন সিমকী আর তার মা যখন ডেকে দাঁড়িয়েছিলো তখন সারেঙ্গ আওরঙ্গ দূর থেকে তাদের দেখে এগিয়ে এসেছিলো, নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলো সে সিমকীর দিকে।

সিমকীর মা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো আওরঙ্গের এই অদ্ভুত আচরণে।

সিমকীও সেদিন কম অবাক হয়নি, সে বলেই বসেছিলো—অমন হা করে কি দেখছো আমার দিকে চেয়ে চেয়ে?

আওরঙ্গ বলেছিলো ব্যথাকরুণ কণ্ঠে—মা তোমার মত আমার একটি মেয়ে ছিলো। মেয়েটি জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলো, তারপর তাকে আর খুঁজে পাইনি। বলে হাতের পিঠে চোখ মুছে ছিলো আওরঙ্গ।

আজ সেও এসে সিমকীর পাশে দাঁড়ালো, বললো কেঁদো না মা, আমি তোমার পাশে আছি।

সময়মতো জাহাজ শাহান শাহ্ এসে মন্থনা দ্বীপে পৌঁছলো।

জাহাজ শাহান শাহ বন্দরে ভিড়তেই অপেক্ষমান আত্মীয়স্বজন এগিয়ে এলো যার যার আত্মীয়স্বজনকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নামিয়ে নিতে।

বন্দরে একটা আনন্দপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছিলো, কারণ যার যার আত্মীয়স্বজন নিজেদের জনকে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। নিজের নিজের জনকে বুকে জড়িয়ে আনন্দধ্বনি করছে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন মন্থনার রাজা এবং মহারাণী তাঁদের পুত্র প্রদীপ কুমারকে নামিয়ে নিতে। চোখেমুখে তাদের খুশির উচ্ছ্বাস, কতোদিন পর তারা সন্তানকে কাছে পাবেন কিন্তু হায়রে দুরাশা, কোথায় তাদের সেই সন্তান। একটু পরেই তাঁরা জানতে পারেলেন প্রদীপ কুমার জাহাজ থেকে উধাও হয়েছে। কোথায় গেলো সে কেউ জানে না।

সংবাদ শুনে হায় হায় করে উঠলেন মহারাজ এবং মহারাণী। মুহূর্তের মধ্যে মন্থনা বন্দরে একটা শোকের হাওয়া বইতে শুরু করলো।

চঞ্চলার আত্মীয়স্বজনও এসে যখন শুনলো চঞ্চলার মৃত্যু সংবাদ তখন আরও একটা কান্নার রোল পড়লো।

সমস্ত বন্দর জুড়ে একটা অশান্তির স্রোত বয়ে চললো। জাহাজ থেকে কফিনে বরফ দেওয়া চঞ্চলার মৃতদেহ নামানো হলো।

সিমকীও এক সময় নেমে এলো জাহাজ থেকে। আওরঙ্গ কথা দিয়েছিলো, সব সময় তার সঙ্গে থাকবে তাই সিমকীর জিনিসপত্র মাথায় নিয়ে নেমে এলো সে সিমকীর পিছনে পিছনে।

অবশ্য সিমকী বলেছিলো, তুমি কেন যাবে আমার সঙ্গে আওরঙ্গ, আমি তো আর তোমার মেয়ে নই? বলেছিলো আওরঙ্গ, তুমি আমার মেয়ের মতো দেখতে, তাই তোমাকে ছাড়তে পারবো না মা আমি।

বেশ চলো কিন্তু মনে রেখো আমার সঙ্গে গেলে যা দেখবে তা কারো কাছে বলবে না।

তওবা তওবা, মেয়ের কাছে বাপ থাকবে আর মেয়ের কথা বলবে সে লোকের কাছে, কি যে বলো মা!

আচ্ছা চলো।

বুড়ো আওরঙ্গ খুশি হয়ে চললো সিমকীর সঙ্গে।

বন্দরের বাইরে বেরিয়ে এলো সিমকী। চোখে গগল্‌স, হাতে এটাচী ব্যাগ। সঙ্গে আওরঙ্গ, তার মাথায় সুটকেস আর বেডিং।

আওরঙ্গ জাহাজের সারেঙ্গ ছিলো এককালে, এখন সে শাহান শাতে খালাসির কাজ করতো। ওকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় এক সময় তার দেহখানা বলিষ্ঠ ছিলো। মাথায় ওর কাঁচা-পাকা একরাশ চুল। মুখে চাপদাড়ি। বয়সের তাড়নায় চোখেমুখে একটা ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ পড়েছে। দেখলে মায়া হয়। সিমকী তাই ওকে ফিরিয়ে দিতে পারলো না।

বন্দরের অদূরে দাঁড়িয়েছিলো একটা ঘোড়াগাড়ি। সিমকী হাত তুলে ইশারা করতেই কোচোয়ান গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে।

কোচোয়ানটা যেন সিমকীর জন্যই অপেক্ষা করছিলো।

গাড়িটা এগিয়ে আসতে সিমকী চেপে বসে! আওরঙ্গকে গাড়ির পিছনে পা-দানিতে দাঁড়াতে বলে সিমকী।

গাড়ি চলতে থাকে।

আওরঙ্গ একটু অবাক হয়, সিমকী তো তার গন্তব্যস্থানের কথা বললো না। তবে কি এ গাড়িখানা তাদের নিজের? হয়তো তাই হবে। যাক, এসব নিয়ে তারা মাথা ঘামানোর দরকার কি। যদি দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায়, একটু মাথা গুঁজবার আশ্রয় পায়, তাহলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবীতে ওর আপনজন বলতে কেউ নেই।

আওরঙ্গ শাহানশাহে খালাসির কাজ করে যা দু'চার টাকা পেতো তা দিয়ে কোনোরকমে পেটের খোরাকটা চলতো। পোশাক পরিচ্ছদ তার বহু পুরোন, বহুকালের। যখন সে সারেং ছিলো তখন যে কাপড় ছিলো তাই তার শরীরে, একটু বোকাটে ধরনের।

ঘোড়াগাড়ির পা-দানিতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো সে তার উপস্থিত অবস্থার কথা। পুঁটলিটা ঝুলিয়ে রেখেছে পাশের হ্যান্ডেলের সঙ্গে, ঐ পুঁটলিই তার সম্বল। ওর মধ্যে আছে তার পুরোন জামাকাপড় আর একটা ছেঁড়া কম্বল।

মন্থনা দ্বীপে কোনোদিন আওরঙ্গ আসেনি, তাই সে অবাক হয়ে দেখছিলো চারদিকে তাকিয়ে।

ঘোড়াগাড়িখানা রাজপথ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সিমকী আওরঙ্গকে ডেকে বলছে—আওরঙ্গ, ঠিকমতো দাঁড়িয়ে আছো তো?

আওরঙ্গ জবাব দিচ্ছে—আছি মা, ঠিক দাঁড়িয়ে আছি।

দেখো পড়ে যেওনা যেন।

না না, পড়বো না মা, বুড়ো হলেও হাতে জোর আছে।

ওর কথা শুনে হাসে সিমকী।

ঘোড়াগাড়িখানা এপথ সেপথ ঘুরেফিরে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করলো। গলিটা কেমন যেন অন্ধকার মনে হচ্ছে।

গাড়িখানা এগুচ্ছে।

কোচোয়ান তার আসনে বসে ঘোড়া দুটোকে চালনা করছে।

পিছনের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ আওরঙ্গ।

ঘোড়াগাড়িখানা গলিপথ অতিক্রম করে বেরিয়ে এলো বাইরে। এবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো আওরঙ্গ। সে আজীবন সমুদ্রে মুক্ত বাতাসে কাটিয়েছে। বদ্ধ গলি তার কাছে অসহ্য।

মুক্ত প্রান্তর অতিক্রম করে গাড়িখানা এগিয়ে চললো। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সম্মুখে একটি বিরাট বন নজরে পড়লো।

গাড়িখানা সেই বন অভিমুখে এগুতে লাগলো।

আওরঙ্গ বললো—মা জি, আর কতোদূর যেতে হবে?

গাড়ির ভিতর থেকে সিমকীর কণ্ঠ ভেসে এলো—আর বেশি দূর নয় আওরঙ্গ। এইতো সম্মুখে যে বন বা জঙ্গল দেখছো সেখানে।

আওরঙ্গ মনে মনে একটু ভড়কে গেলেও মুখে সে কোনো কথা বললো না। জঙ্গলের মঙ্গে ওর বাড়ি, এ কেমন কথা!

গাড়িখানা দ্রুত ছুটছে।

এলোপাতাড়ি এবড়ো থেবড়ো পথ। গাড়িখানা বেজায় ঝাঁকুনি খাচ্ছিলো। শক্ত করেই ধরে আছে আওরঙ্গ গাড়ির পিছন হ্যান্ডেলখানা। মাঝে মাঝে যদিও সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো তবু সে যাতে পড়ে না যায় সেজন্য হুশিয়ার ছিলো সব সময়।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িখানা পৌঁছে গেলো বনের পাশে।

একটি পথ বনের মধ্যে চলে গেছে সোজাসুজিভাবে। ঐ পথে ঘোড়াগাড়িখানা চলতে লাগলো।

সিমকী আবার বললো—আওরঙ্গ, ঘাবড়ে যাচ্ছো না তো? বলেছি যা দেখবে কাউকে বলবে না?

না, বলবো না কাউকেই।

হাঁ, সব সময় মনে রাখবে এ কথাটা এবং সে কারণেই তোমাকে আমি সঙ্গে এনেছি।

সব মনে আছে আমার মা। বললো আওরঙ্গ।

সিমকী গলা বাড়িয়ে কথা বলছিলো, এবার সে সোজা হয়ে বসে।

দু'পাশে গহন বন, মাঝখান দিয়ে সরু পথ। বনের মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশে সক্ষম নয়। একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে বনটার মধ্যে।

কিছুদূর এগিয়ে একটা পোড়োবাড়ি নজরে পড়লো। ঠিক পোড়ো-বাড়ি নয়, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

গাড়িখানা সেই মন্দিরের সম্মুখে এসে থামলো। নেমে দাঁড়ালো সিমকী, আওরঙ্গও নেমে পড়েছে, সে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে চারিদিকে।

সিমকী হেসে বললো—খুব আশ্চর্য হয়ে গেছো, তাই না? এটাই আমার বাড়ি। তুমি থাকবে আমার কাছে কাছে, কেমন?

একটা ঢোক গিলে বললো আওরঙ্গ—আচ্ছা। চোখেমুখে তার বিস্ময় ও ভয় ফুটে উঠেছে। সে কোনোদিন বনজঙ্গলে আসেনি। এটাই তার প্রথম বনের মধ্যে আসা, কাজেই একটু ঘাবড়ে যাবার কথাই বটে।

সিমকী বললো—ক'দিন থাকলেই অভ্যাস হয়ে যাবে আওরঙ্গ। এসো আমার সঙ্গে।

মন্দিরের ভাঙ্গা দরজা পেরিয়ে ভিতরে চলে গেলো সিমকী। আওরঙ্গ তাকে অনুরসণ করলো।

কোচোয়ান গাড়ি নিয়ে ফিরে চললো আবার।

সিমকী ভাঙ্গা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আওরঙ্গকে লক্ষ্য করে বললো—সাবধান, কোনো কথা বলবে না।

আচ্ছা মা।

সিমকী এগিয়ে চলেছে।

যতো এগুচ্ছে আওরঙ্গ ততোই অবাক হচ্ছে, বাইরে থেকে ভাঙ্গা মন্দির দেখা গেলেও ভিতরটা ভাঙ্গা বা নোংরা নয়, সুন্দর ঝকঝকে সান বাঁধানো পথ। দু'পাশে পাথুরে দেয়াল। দেয়ালে এক স্থানে মশাল গোঁজা আছে। মশালের উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করছে চারদিক।

কিছুটা এগুতেই দু'জন অস্ত্রধারী প্রহরী পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

সিমকী হাত বাড়িয়ে অংগুরি দেখাতেই ওরা অস্ত্র সরিয়ে নিয়ে পথ মুক্ত করে দিলো।

আওরঙ্গ অবাক হয়ে এগুচ্ছে। সিমকী বারণ করে দিয়েছে কোনো কথা সে বলবে না, তাই সে চুপচাপ রয়েছে। যতোই এগুচ্ছে ততোই বিস্মিত হচ্ছে আওরঙ্গ। তাকে সিমকী কোথায় নিয়ে এলো।

কিছুদূর এগুতেই আরও দু'জন প্রহরী পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

সিমকী তাদের সম্মুখেও হাত বাড়িয়ে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে পথ মুক্ত করে দিলো প্রহরী দু'জন।

এক স্থানে এসে একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সিমকী এবার নিচের একটি বিরাট কক্ষমধ্যে এসে দাঁড়ালো। সেখানে অনেকগুলো জোয়ান বসে বসে অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করছিলো।

সিমকীকে দেখেই ওদের মধ্য থেকে একজন বললো—চন্দনা এসেছো? পরক্ষণেই লোকটা আওরঙ্গকে লক্ষ্য করে বললো—একে তো চিনতে পারছি না, কে এ?'

সিমকী হেসে বললো—বেচারা আমাকে ওর মেয়ের মতো দেখে মেয়ে বানিয়ে নিয়েছে। বৃদ্ধ এককালে সারেঙ্গ ছিলো, উপস্থিত খালাসির কাজ করতো। আমি ওকে নিয়ে এলাম, বড় কষ্ট ওর.....

তা একেবারে গুহার অভ্যন্তরে?

অবিশ্বাসের কিছু নেই। ও খুব ভাল.....শোনো হামিদ, একে রাখো, যখন রাণীর হুকুম পাবো তখন ওকে তার সম্মুখে হাজির করবো।

বললো হামিদ—একে দিয়ে কি কাজ হবে?

বড় বিশ্বাসী.....জানো তো পিপীলিকাও কাজে আসে। আওরঙ্গ, তুমি এখানে বসো, বিশ্রাম করো।

আচ্ছা মা জি! বলে পাশের একটা টুলের উপর বসে পড়লো আওরঙ্গ।

সিমকী চলে গেলো।

ঠিক ওটা কক্ষ নয়, ভূগর্ভে একটি গুহা। গুহার মধ্যে নানা রকম অস্ত্র থরে থরে সাজানো। নানারকম কলকারখানা আর বিরাট বিরাট পিঁপে ভর্তি নানারকম গোলাবারুদ।

❑

দেয়ালে নানারকম পোশাক এবং ঢাল-তলোয়ার। আরও অনেক রকম সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। আওরঙ্গ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর বারবার হাই তুলছিলো।

সিমকী সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা এগিয়ে চললো। কিছুটা সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে সে নেমে এলো আরও নিচে।

একটি বিরাট গুহাকক্ষ।

কক্ষমধ্যে সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট একটি নারীমূর্তি। সমস্ত দেহ আলখেল্লায় ঢাকা। মুখের নিচের অংশ কালো রুমালে আচ্ছাদিত।

সিমকী এসে কুর্ণিশ জানালো।

সিংহাসনে উপবিষ্ট নারীমূর্তি বললো—এসেছো?

সিমকী বললো—হাঁ রাণী, কিন্তু একটি দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ! অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো নারীমূর্তি।

সিমকী বললো—শেষ পর্যন্ত প্রদীপ কুমার নিখোঁজ।

নারীমূর্তি ইংগিত করলো যারা তখন কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়েছিলো তাদের বেরিয়ে যাবার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে নারীমূর্তির অনুচরগণ বেরিয়ে গেল।

নারীমূর্তি মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললো—তীব্রকণ্ঠে বললো—প্রদীপ কুমার নিখোঁজ?

হাঁ রাণী।

আশ্চর্য.....নারীমূতি আসন ত্যাগ করে সিংহাসনের পাশে পায়-চারী করতে লাগলো তার দীপ্ত সুন্দর ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠেছে।

সিমকী নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো নারীমূর্তির মুখে।

নারীমূর্তি বললো—চন্দনা, যাকে আমরা বন্দী করে এনেছি সে আসলে দস্যু বনহুর নয়।

সিমকী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—বলো কি রাণী?

হাঁ চন্দনা, জীবনে এ আমার চরম পরাজয়। আশ্চর্য, এদের দু'জনার চেহারা সম্পূর্ণ এক।

সিমকী বললো—তবে কি তুমি বলতে চাও যাকে তুমি বন্দী করে এনেছো সেই প্রদীপ কুমার?

হাঁ।

কিন্তু.....;

কোনো কিন্তু নেই, যার সঙ্গে তুমি প্রেমের অভিনয় করেছিলে তিনিই স্বয়ং দস্যু বনহুর।

রাণী!

হাঁ চন্দনা।

রাণী, প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিলো, তার কথাবার্তা, চাল-চলন মোটেই সাধারণ মানুষের মতো ছিলো না। প্রত্যেকটা কথায় ছিলো তার অদ্ভুত এক বলার ভঙ্গী.....

চন্দনা, এখন কি করবো?

জানি, এ ভুলের জন্য চরম এক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। দস্যু বনহুর আমাদের এই বোকামি লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই মনে মনে বিদ্রূপ করেছে। চন্দনা, আমি যদি পূর্বে কোনোদিন দস্যুটাকে এক নজর দেখতাম তাহলেই এমন ভুল হতো না।

রাণী, তুমি কি করে বুঝলে যাকে তুমি আটক করেছো সে দস্যু বনহুর নয়?

তার সঙ্গে কথাবার্তায় আমি বুঝেছি। কারণ দস্যু বনহুর যে সে নয়, এটা সে নিজেই তার প্রমাণ।

সত্যি, তুমি অদ্ভুত নারী রাণী—কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল তা তার কথাবার্তার মধ্যেই আবিষ্কার করে নিয়েছো। রাণী, আমার কিন্তু এখনও সন্দেহ আছে তুমিই তো ভুল করছো না?

তার মানে? ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকালো রাণী চন্দনার মুখের দিকে।

চন্দনা বললো—যাকে তুমি প্রদীপ কুমার বলে ভুল করছো আসলে সেই দস্যু বনহুর?

না, তেমন ভুল আমার হবে না।

রাণী, চঞ্চলার মৃত্যু...

ঐ বিশ্বাসঘাতকিনীর নাম মুখে এনো না চন্দনা। ওকে হত্যা না করলে সে নিশ্চয়ই আমার গোপন রহস্য ফাঁস করে দিতো। হাঁ, ওর মৃতদেহ এসে পৌঁছেছে?

এখনও এসে পৌঁছায়নি।

ওকে সমাধিস্থ না করে আমার হিমাগারে রেখে দিও। কোনোদিন ওর পিতা ফিরে এলে তাকে তার কন্যা ফেরত দেবো।

রাণী, তুমি সত্যি পাষাণী। যাকে তুমি নিজের হাতে হত্যা করছো, তারই মৃতদেহ কি করে তার স্নেহময় পিতার হাতে তুলে দেবে?

রাণী হঠাৎ হেসে উঠলো, অদ্ভুত সে অট্টহাসি, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—পাষাণীই শুধু নই চন্দনা যে কাজ আমি করি তা নরপিশাচিনীর চেয়েও জঘন্য। চঞ্চলার জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না।

আচ্ছা রাণী, দস্যু বনহুর তোমার কি ক্ষতি করেছে যে কারণে তুমি তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছো?

সে কথা আজ নতুন করে শুনতে চাস্ তুই?

হাঁ রাণী।

দস্যু বনহুর আমার আত্মসম্মানে আঘাত করেছে। সে মনে করে এ পৃথিবীতে তার মতো দ্বিতীয় কোনো দস্যু নেই যার সঙ্গে তার তুলনা হয়।

এ কারণেই তুমি তাকে...

হাঁ চন্দনা, আমি যতোক্ষণ তাকে বন্দী করতে সক্ষম না হয়েছি ততোক্ষণ আমার স্বস্তি নেই। এটা আমার মনের ইচ্ছা, বুঝলি?

যদিও আগে হতেই আমি বুঝেছিলাম তবু আবার নতুন করে বুঝলাম, শুনলাম তোমার মুখে।

চন্দনা, দস্যু বনহুরকে দেখিনি তবে শুনেছি মন্থনার রাজকুমার প্রদীপের চেয়েও সুন্দর। তার সেই সৌন্দর্যের মোহে সবাই আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভালবেসে ফেলে। শুনেছি সেই সুযোগ নিয়েই সে সকলের...

সর্বনাশ করে, এই তো?

সর্বনাশ না করলেও আমি বলি সে যা করে তা অন্যায়। বহু নারীর হৃদয় সে জয় করে নিয়েছে তাদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কাউকেই ধরা দেয় না। দাঁতে দাঁত পিষে বলে রাণী—নারীদের নিয়ে সে খেলা করে, এ তার চরম অপরাধ। জানিস চন্দনা, আমার বান্ধবী হীরা বাঈকে সে ধোকা দিয়েছে। রাজকুমারী হীরা আজও ঐ দস্যুর প্রেমে আত্মহারা। সে এখনও তার মূর্তি হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে একদিন নাকি সে ফিরে আসবে তার কাছে।

চন্দনা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে—হীরা বাঈ! কে সে হীরা বাঈ রাণী?

সিন্ধের রাজকুমারী হীরা।

সেই হীরা তোমার বান্ধবী?

হাঁ চন্দনা, ছোটবেলায় একসঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সিন্ধের এক মেলায়। যদিও সে রাজকুমারী তবু তার যে ব্যবহার আমি পেয়েছি তা কোনোদিনই ভুলবো না।

রাণী, কই ওর সম্বন্ধে তুমি তো কোনোদিন বলোনি?

একটু হেসে বললো রাণী—এতো সময় আমার হাতে কই চন্দনা।

না, ওর সম্বন্ধে তোমাকে বলতেই হবে, কারণ যে নারী দস্যু বনহুরকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো অথচ তার কাছে পেয়েছে উপেক্ষা...

উপেক্ষা নয়, অবজ্ঞা বলতে পারিস্। আজ নয়, আর একদিন বলবো তোকে হীরা বাঈয়ের কথা।

মনে থাকবে তো?

নিশ্চয়ই থাকবে।

শোনো রাণী, একটা কথা তোমাকে এখনও বলা হয়নি।

কি কথা?

আওরঙ্গ নামে এক বৃদ্ধ সারেঙ্গ আমার সঙ্গে এসেছে। বেচারা বড় দুঃখী। আমাকে ও মেয়ের মতো ভালবাসে। যদি তুমি মত দাও তাহলে আমি ওকে আমার কাছে রাখতে পারি?

বেশ, তোর যদি এতো দয়া হয় রাখতে পারিস্। কিন্তু মনে রাখিস্ কোনো চালাকি-টালাকি নেই তোর ওর মধ্যে?

না না, সে সব আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তবে সঙ্গে এনেছি। বড় ভাল, বড় সহজ-সরল লোক, তাছাড়া বুড়োমানুষ।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একজন অনুচর এসে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—রাণীজি, লাশের বাক্স এসে গেছে।

রাণী চন্দনাকে লক্ষ্য করে বললো—যাও চন্দনা, চঞ্চলার মৃতদেহ কফিন সহ হিমাগারে রেখে দাওগে।

চন্দনা কোনো কথা না বলে চলে যায়।

❑

চমকে উঠে আওরঙ্গ, তার সম্মুখে চারজন লোক একটি কফিন বহন করে এনে রাখলো। বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো আওরঙ্গ, হঠাৎ যেন সে আঁতকে উঠে। সিমকী সেই যে চলে গেছে এতোক্ষণও ফিরেনি। কক্ষমধ্যে যারা কাজ করছিলো তারা কেউ কেউ এখনও কাজ করছে, আর কেউ কেউ চলে গেছে নিজ নিজ কাজ সমাধা করে অন্য কাজে।

আওরঙ্গ বসে বসে হাঁপিয়ে উঠছিলো, সে মাথাটা দু হাঁটুর মধ্যে গুঁজে ঝিমুচ্ছিলো। কফিন রাখার শব্দে এবং লোকজনের কথা বার্তায় তন্দ্রা ছুটে যায় তার, সজাগ হয়ে বসে। ভাবে আওরঙ্গ এ কফিন এলো কোথা থেকে। সে অবশ্য চঞ্চলার মৃতদেহের সম্বন্ধে জানতো কিন্তু চোখে সে দেখেনি, তাই বুঝতেও পারেনি কিছু।

আওরঙ্গ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো।

এমন সময় সিমকী এলো হন্তদন্ত হয়ে। তার সঙ্গে আরও দু'জন লোক। যারা কফিন বহন করে এনেছিলো তারাও দাঁড়িয়ে ছিলো কফিনটার চারপাশে।

সিমকী বললো—কফিন উঠিয়ে নাও।

লোক চারজন পুনরায় কফিন তুলে নিলো কাঁধে।

সিমকী বললো—এসো আমার সঙ্গে।

আওরঙ্গ বলে উঠে—মা মণি, আমি বসে থাকবো?

তুমি...আচ্ছা এসো। সিমকী এগুলো তাকে অনুসরণ করলো আওরঙ্গ।

ভূগর্ভে যে এমন কারুকার্য খচিত দালান কোঠার মতো সারি সারি গুহা আছে তা আওরঙ্গ কেন, কেউ ভাবতেও পারবে না কোনোদিন। আওরঙ্গ যত এগুচ্ছে ততই বিস্মিত হচ্ছে।

নিকষ অন্ধকার এক সুড়ঙ্গ পথ।

সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হলো সেখানে একটি অদ্ভুত ধরনের গুহা। একটি পাথর দিয়ে গুহামুখ বন্ধ করা ছিলো।

কফিনটা নিচে নামিয়ে রেখে গুহামুখের পাথরখানা সরিয়ে ফেললো লোক চারজন। তারপর ওরা কফিন নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

সিমকী দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে।

একটু পর ফিরে এলো কফিনের বাহক চারজন।

সিমকী বললো—তোমরা যাও, আমি আওরঙ্গকে তার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

ওরা চলে গেলো।

সিমকী বললো—আমার রাণীর কাছে অনুমতি পেয়েছি আওরঙ্গ। তোমাকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। রাণী তোমাকে রাখার অনুমতি দিয়েছে। আচ্ছা আওরঙ্গ—

বলো মা জি?

তুমি কি কাজ পারবে? বুড়ো মানুষ, তোমাকে কোনো কঠিন কাজ দেবো না। হাঁ শোন আওরঙ্গ, তুমি আমার মুলকী আর রাণীর রুহীকে দেখাশোনা করবে। সব সময় ওদের কাছে কাছে থাকবে আর যত্ন করবে, কেমন?

আচ্ছা মা জি।

শোন, ওদের খাওয়া-দাওয়া তোমাকে করাতে হবে না, তার জন্য অন্য লোক আছে। সিমকী অদূরে দন্ডায়মান এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে—তিলক, একে নিয়ে যাও মুলকী আর রুহীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাওগে। যাও আওরঙ্গ.....

তিলক আওরঙ্গ সহ চলে যায়।

সিমকী পা বাড়ায় অন্য পথে।

আওরঙ্গ মনে ভীষণ চিন্তা উঁকি দেয়, মুলকী আর রুহী এরা আবার কেমন মেয়ে কে জানে। তাকে কেমন চোখে দেখবে—ঘৃণা করবে না সমীহ করবে, তাইবা কে জানে। সে এসেছে একমুঠো ভাতের জন্য আর একটু আশ্রয়ের জন্য। কাজ সে পারে না, সন্ধ্যের পর চোখে দেখে না আজকাল ভাল করে। আওরঙ্গের মনে পড়ে বহুদিন আগের কথা, সে যখন জোয়ান ছিলো তখন তার স্ত্রী আর একটি মেয়ে নিয়ে কত সুখে-শান্তিতেই না ছিলো। আর এখন সে পরিশ্রম করতে পারে না, আর পারে না বলেই না সে এসেছে সিমকীর সঙ্গে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যায় আওরঙ্গ। তাকিয়ে দেখে বেশ পরিস্কার সচ্ছ আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে সে আর তিলক।

তাকিয়ে দেখলো আওরঙ্গ অদূরে পাশাপাশি দুটো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। আওরঙ্গ চারিদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো কোনো মেয়ে মানুষ দেখা যায় কিনা। কিন্তু কোনো মেয়ে মানুষ নজরে পড়লো না। শুধু দুটো ঘোড়া।

তিলক বললো—তোমার নাম কি বুড়ো?

আমার নাম আওরঙ্গ।

হেসে উঠলো তিলক—আওরঙ্গজেব নাকি?

না, শুধু আওরঙ্গ বলেই আমাকে সবাই ডাকে। তুমিও ডেকো কই, মুলকী আর রুহীকে দেখছি না তো?

তুমি কি অন্ধ ঐ তো তোমার সামনে মুলকী আর রুহী।

ঐ ঘোড়া দুটোর কথা বলছো?

তা নয় তো কি ভেবেছো তুমি?

ভেবেছিলাম কোনো মেয়েমানুষ.....

বুড়ো বয়সে আবার মেয়েমানুষের সখ কেন বাবা?

সখ নয়, সখ নয় বিপদ.....মেয়ে মানুষ দেখলে বিপদে পড়ি, বুঝলে বাবা। তা ঘোড়া দুটোর কি করতে হবে?

দেখাশুনা করবে।

বেশ তাই হবে।

আমি চলালাম তুমি থাকো।

তিলক পা বাড়াতেই বলে উঠে আওরঙ্গ—তুমি তো চললে ভায়া কিন্তু আমার পেট যে চোঁ চোঁ করছে।

ভয় নেই, ঠিক সময় খেতে পাবে।

আচ্ছা।

তিলক চলে যায়।

আওরঙ্গ এবার ভাল করে তাকায় ঘোড়া দু টোর দিকে। একটি জমকালো একটি সাদা ধব্ ধবে যেন অমাবস্যা আর জ্যোছনা রাত। আওরঙ্গ বুঝতে পারলো, আজ থেকে এ দু'জনের দেখাশোনার ভার তারই উপর রইলো।

❑

সমস্ত দেহে শিকারীর জমকালো ড্রেস। পায়ে ভারী বুট। মাথায় ক্যাপ। কোমরের বেল্টে রিভলভার একপাশে তীক্ষ্ণ ধার ছোরা। চোখেমুখে চিন্তার ছাপ, রেশমের মত রাশিকৃত চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধে পিঠে।

পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে চন্দনা, ওর শরীরেও রাণীর অনুকরণে পোশাক। ওর কোমরের বেলটে রিভলবার এবং ছোরা। ওরা দু'জন সুড়ঙ্গ পথে ধীরে ধীরে পা রেখে এগুচ্ছিলো আর কথাবার্তা বলছিলো।

এ মুহূর্তে ওদের দেখে মনে হচ্ছিলো কোনো জরুরি কাজ নেই ওদের হাতে, তাই ওরা ধীরে সুস্থে এগুচ্ছিলো আর কথাবার্তা বলছিলো।

বললো চন্দনা—রাণী, যদি চিনতেই পেরেছো যাকে তুমি বন্দী করে এনেছো তিনি দস্যু বনহুর নন তবে কেন ধরে রেখেছো? মুক্তি দিলেই পারো!

রাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—আমার এ পরাজয়ের কথা এখনও আমার অনুচরদের কেউ জানে না, শুধু জানিস তুই আর আমি। আমার অনুচরগণ সবাই জানে দস্যু বনহুরকে আমি বন্দী করতে সক্ষম হয়েছি। তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার জয়ধ্বনিতে ভূগর্ভ আস্তানা প্রকম্পিত করে তুলেছিলো! যদি তারা জানতে পারে তাদের রাণী ভুল করে আর একজনকে দস্যু বনহুর বানিয়ে বন্দী করে এনেছে.....না না চন্দনা, আমি ওদের সামনে মুখ দেখাতে পারবো না। তাছাড়া ওরা জানে, ওদের রাণী কোনোদিন ভুল করতে পারে না।

রাণীর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। দস্যু বনহুরের চেয়ে সে কোনো অংশে কম নয়। বনহুরের নামে দেশবাসী যেমন আতঙ্কগ্রস্ত, তেমনি দস্যু রাণী নামেও মানুষ শিউরে উঠে। ধন কুবেরদের তো আত্মা খাঁচাছাড়া হয়।

দস্যু বনহুরের বিচরণ পৃথিবীর উত্তরাংশে আর দস্যু রাণীর বিচরণ সম্পূর্ণ দক্ষিণাংশে, কাজেই কারো সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ লাভের কোনো সম্ভাবনাও ছিলো না।

মাঝে মাঝে দস্যুরাণী তার মন্থনা দ্বীপ আস্তানায় আসতো। এমনি একদিন দস্যুরাণী যখন তার মন্থনা দ্বীপ আস্তানার উদ্দেশ্যে স্থলপথে রুহীকে নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিলো তখন পথিমধ্যে হীরাবাঈয়ের সংগে সাক্ষাত করাই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য।

রাজকুমারী হীরাবাঈ ছিলো দস্যুরাণীর বান্ধবী! দু'বান্ধবীর মধ্যে স্বহৃদয়তা ছিলো অত্যন্ত গভীর। যদিও ওদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ কদাচিত ঘটতো।

এমনি একদিন দস্যুরাণী আর হীরাবাঈ মিলে যখন মিলিত হয়েছিলো তখন হীরার মুখে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলো। সেদিন থেকেই দস্যুরাণীর মনে একটা দারুণ ক্রোধ বেঁধে উঠেছিলো যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে সে বন্দী করবে এবং তার বান্ধবী হীরাবাঈকে অবজ্ঞা করার প্রতিশোধ নেবে। মনে মনে শপথ গ্রহণ করেছিলো দস্যুরাণী।

অবশ্য দস্যু বনহুর সম্বন্ধে দস্যুরাণী যে একেবারে অজ্ঞ ছিলো তা নয়। সে জানতো দস্যু বনহুর একজন প্রখ্যাত দস্যু। তার কার্যকলাপও কিছু কিছু কানে এসেছিলো তার কিন্তু দস্যুরাণী মনোযোগ দিয়ে শোনেনি কোনদিন বা ভাবেনি ওর সম্বন্ধে তেমন করে।

তার প্রিয়তম বিশ্ব-বিখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ আহাদ চৌধুরীর মুখেও দস্যু বনহুরের কৃতিত্বের কথা শুনেছিলো তবু গ্রাহ্য করেনি দস্যু রাণী। কারণ সে জানে তার মত দস্যু এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় জন নেই।

এবার দস্যুরাণী চন্দনা সহ এসেছে মন্থনায়।

উদ্দেশ্য তার দস্যু বনহুরকে আটক করা এবং তাকে সায়েস্তা করা।

সংবাদটা তারই প্রধান অনুচর রহমতই তাকে দিয়েছিলো বলেছিলো রহমত—রাণীজী, কান্দাই থেকে আমাদের অনুচর জানিয়েছে দস্যু বনহুর ভ্রমে পুলিশ মহল রাজপুত্র প্রদীপ কুমারকে আটক করেছিলো এবার তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গোপনে তারা জানতে পেরেছিলো দস্যু বনহুর প্রদীপের সঙ্গে জাহাজ শাহান শাতে মন্থনা দ্বীপ অভিমুখে যাচ্ছে।

সংবাদ শোনা মাত্র দস্যুরাণীর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিলো এক অদ্ভুত দীপ্ত ভাব। জ্বলে উঠেছিলো তার চোখের তারকা দুটো জ্বল জ্বল করে। সেদিন দস্যুরাণী ভাবতে পারেনি এমনভাবে সে পরাজিত হবে দস্যু বনহুরের কাছে।

দস্যু রাণীর মুখোভাব লক্ষ্য করে চন্দনার মনটা ব্যথাকাতর হয়ে উঠলো বললো সে—রাণী, তা হলে তুমি কি করতে চাও বলো?

যতক্ষণ না দস্যু বনহুরকে আটক করতে পেরেছি ততক্ষণ প্রদীপ কুমারকে বন্দী থাকতেই হবে।

কিন্তু দস্যু বনহুরকে তুমি কোথায় খুঁজে পাবে রাণী? সেকি মন্থনায় আসবে?

না এলেও তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

রাণী তুমি না বলেছিলে তোমার বান্ধবী হীরাবাঈ সম্বন্ধে বলবে? আজ তুমি অবসর আছো বলোনা কে সেই হীরাবাঈ? আর দস্যু বনহুরের সঙ্গেই বা তার কি করে পরিচয় হলো!

একটু হেসে বললো রাণী—শুধু পরিচয় নয় চন্দনা। গভীর ভালবাসা তবে হাঁ যতটুকু আমি শুনেছি তাতে মনে হয় দস্যু বনহুরও তাকে ভালবেসেছিলো।

ভূমিকা রেখে বলোনা শুনি আসল কথাগুলো? যার জন্য তুমি এমন একটা অদ্ভুত বসানাকে চরিতার্থ করতে চলেছো?

রাণীর হাতে ছিলো একটি চাবুক।

এ চাবুকখানা হাতে নিয়ে রাণী রুহীতে আরোহণ করতো। চাবুক দিয়ে সে লাগামের কাজ করতো। রাণী চাবুকখানা দোলাতে দোলাতে ধীরে ধীরে পা ফেলছিলো। ওরা সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে সুড়ঙ্গ মুখের বাইরে এসে দাঁড়ালো। অদূরে ঘাস খাচ্ছিলো রুহী আর মুলকী।

রুহী এবং মুলকীর কিছু দূরে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো আওরঙ্গ।

সেদিনের পর থেকে আওরঙ্গ সদা সর্বদা রুহী আর মুলকীকে দেখা শোনা করে। এ ছাড়া আর কিইবা কাজ করবে সে। শক্ত কোন কাজ সে এখন পারেও না তেমন করে।

রাণী আওরঙ্গকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

চন্দনা বললো—রাণী ওর কথাই তোমাকে সেদিন বলেছিলাম। বড় ভাল লোক। বেচারীর এ দুনিয়ায় কেউ নেই...

তাতো বুঝলাম কিন্তু ওখানে বসে ও কি করছে?

রাণী তোমাকে না বলেই আমি ওকে একটা কাজ দিয়েছি। রুহী আর মুলকীকে দেখা শোনা করবে। বুড়ো মানুষ তাই...

তা বেশ করেছো ওর কোনো অসুবিধা যেন না নয়। অন্যমনস্কভাবে কথাগুলো বলে রুহীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রাণী। রুহীর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো সে।

রুহী তার প্রভুকে পাশে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে শব্দ করতে লাগলো।

চন্দনা বললো—চলো রাণী ও পাশে ঝরণার ধারে গিয়ে বসি।

রাণী হেসে বললো—তুই হীরার কথা না শুনে ছাড়বিনা দেখছি। চল ঝরণার ধারে গিয়েই বসি।

রাণী আর চন্দনা অদূরে ঝরণার ধারে গিয়ে বসে।

চন্দনা বলে—হীরাবাঈ তোমার কেমন বান্ধবী বলো?

চন্দনা হীরা আমার প্রাণের বান্ধবী যদিও আমি আর তার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

বলোনা কেমন করে ওর সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয়?

সব তোকে বলতে হবে?

হাঁ আমি শুনবো— শুনতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে কারণ সে রাজকুমারী আর তুমি দস্যুরাণী কি করে তোমরা বান্ধবী হলে?

ঠিক বলতে কি ওর সঙ্গে আমার আচমকা পরিচয়। সেবার রায়হান বন্দর থেকে রওরানা দিয়ে আমি যখন সিওগাঁহিন্দ যাচ্ছিলাম তখন জাহাজে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হীরা আমাকে আকৃষ্ট করে ফেলে ওর মধুর ব্যবহারে। জাহাজে আমাকে প্রায় দুসপ্তাহ কাটাতে হয়েছিলো সেবার। থামলো রাণী।

চন্দনা বললো—তারপর?

যে ক'দিন জাহাজে ছিলাম দু'জনার মধ্যে একটা গভীর ভালবাসা জমে উঠেছিলো। সব সময় হীরা আর আমি একসঙ্গে থাকতাম। ও আমাকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলো—আমাকে ও মনের সব কথা বলতো। একদিন কথায় কথায় বললো সে—জানো রাণী, পুরুষ জাতকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি জিজ্ঞসা করেছিলাম—কেন, পুরুষ জাত তোমার কি ক্ষতি করেছে? বলেছিলো হীরা—সে অনেক কথা। তখন একটা গভীর বেদনার ছায়া ভেসে উঠেছিলো হীরার মুখমণ্ডলে। চন্দনা, কেন জানি না সেদিন ওর সেই ব্যথা ভরা মুখখানা আমাকে ভীষণ কাতর করে তুলেছিলো।

হীরা বলে চলেছে—বেশ কয়েক বছর আগের কথা, আমার সহচরীদের নিয়ে আমি একদিন সমুদ্রতীরে স্নান করতে গিয়েছিলাম। তখন সবেমাত্র পূর্বাকাশে সূর্যদেব উঁকি দিচ্ছে। আমার সহচরীসহ আমি উচ্ছল আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে সমুদ্রতীরাভিমুখে

চলেছি। সেদিন কেন যেন বড় ভাল লাগছিলো আমাকে। আমার দক্ষিণ বাহু বারবার স্পন্দিত হচ্ছিলো। আমি জানতাম, দক্ষিণ বাহু স্পন্দন কোন শুভ লক্ষণ। তাই মনে মনে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলাম। তারপর সমুদ্রতীরে পৌছলাম। ভোরের সূর্যের আলোতে সমুদ্রতীর ঝকঝক করছে। অপূর্ব সে শোভা। সমুদ্রতীরে এসে আমরা এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ আমার দৃষ্টি চলো গেলো দূরে বালুচরে। দেখলাম একটি লোক উপুর হয়ে পড়ে আছে। ততোক্ষণে আমার সহচরীদের দৃষ্টিও গিয়ে পড়েছে সেইদিকে। আমি প্রথমে পা বাড়ালাম, চলতো দেখি লোকটা মৃত না জীবিত। গিয়ে দেখলাম একটা লোক উপুর হয়ে পড়ে আছে সে মৃত না জীবিত, বোঝা যাচ্ছে না। আমার সহচরদের আদেশ দিলাম লোকটাকে চীৎ করে ফেলার জন্য। আমার সহচরীগণ আদেশ পালন করলো। রাণী, তোমাকে কি বলবো ওকে চীৎ করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত হৃদয়ে একটা বিপুল অনুভূতি অনুভব করলাম। কারণ লোকটির মুখমণ্ডলে এক আভিজাত্যের ছাপ ফুটে আছে, বলিষ্ঠ সুন্দর দীপ্ত একটি মুখ। সে রকম সুন্দর মুখ আর হয় না। আমিই প্রথমে ওর বুকে কান রেখে পরীক্ষা করে দেখলাম। দেখলাম সে জীবিত আছে। সহচরীদের লক্ষ্য করে বললাম, একে নিয়ে চল বাঁচাতে হবে। হীরা কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে থেমেছিলো।

আমি তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম।

চন্দনা বলে উঠলো—যেমন আজ আমার অবস্থা হয়েছে? বলো রাণী, তারপর?

রাণী তাকিয়েছিলো ঝরণার ঝরে পড়া সচ্ছ সাবলীল জলধারার দিকে। হয়তো বা ওর চোখের সামনে ভাসছিলো হীরার সেদিনের মুখখানা। বলতে শুরু করলো রাণী—হীরা বলে চললো—সহচরীদের সহায়তায় ওকে নিয়ে এলাম রাজ অন্তঃপুরে। এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখলাম অতি সাবধানে। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম কখন ওর সংজ্ঞা ফিরে আসবে। আমি এবং আমার সহচরীগণ নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে ওর জ্ঞান ফিরে আসে। এক সময় জ্ঞান ফিরে এলো ওর। রাণী, তোমাকে কি বলবো, ওর সেই প্রথম দৃষ্টি আজও আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। অদ্ভুত নীল দুটি চোখে অন্তঃর্ভেদী দৃষ্টি সুস্থ হয়ে উঠলো ও। আমি ওকে ভালবেসে ফেললাম। আমার সহচরীদের সহায়তায় ওকে আমি রাজঅন্তঃপুরের একটি গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখলাম।

গভীর রাতে যখন সমস্ত রাজঅন্তঃপুর নিদ্রায় অচেতন থাকতো তখন আমার প্রধান সহচরী রত্না এসে আমাকে নিয়ে যেতো ওর কাছে। আমিও ওকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হতাম, ভুলে যেতাম আমার অস্তিত্ব, আমি নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলতাম। রাণী, সেই মুহূর্তগুলো আমার যে কিভাবে কাটতো তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। প্রথম প্রথম রাতের বেলা আসতাম ওর কাছে, তারপর দিনের বেলায়ও আসতে শুরু করলাম।

আমি বলেছিলাম—হীরা, তোমার দুঃসাহস তো কম নয়?

বলেছিলো হীরা—ওর সঙ্গ আমাকে দুঃসাহসী করে তুলেছিলো রাণী। শুধু ওর সঙ্গে মিলিত হতেই আসতাম না। সহচরীদের সহায়তায় আমরা গোপনে ওকে নিয়ে সমুদ্রে বজরায় বেড়াতে বের হতাম। সেকি আনন্দ, ও আর আমি বজরার ছাদে বসে তাকিয়ে থাকতাম জ্যোছনাভরা সমুদ্রের দিকে। হঠাৎ দৃষ্টি আমার চলে যেতো ওর মুখে। জোছনার আলোতে অপূর্ব লাগতো ওকে। আমি সম্মোহিত হয়ে পড়তাম। রাণী, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না, আমার সমস্ত হৃদয়-মন ওকে সঁপে ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে আমি ধরে রাখতে পারলাম না.....ফুপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো হীরা।

জানিস চন্দনা, তখন ওর জন্য আমার এতো বেশি দুঃখ হলো যে, আমি ঐ মুহূর্তে মনে মনে শপথ করলাম, বললাম—হীরা, কে সে যুবক যাকে তুমি মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করলে অথচ সে তোমাকে অবজ্ঞা করলো, উপেক্ষা করলো তোমার ভালবাসাকে। হীরার দু'গণ্ড বেয়ে তখন দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে বললো হীরা, বিদায় নেবার মুহূর্তে সে নিজের পরিচয় আমাকে জানিয়েছিলো, সে নাকি দস্যু বনহুর। চন্দনা, সেদিন দস্যু বনহুর নামটা শুনে আমার ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছিলো। ঐ নরপিশাচ হীরার সরলতা নিয়ে তার হৃদয় জয় করে পরে তাকে তুচ্ছ বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলো। এতোবড় স্পর্ধা তার। হীরার হাত ধরে আমি কথা দিয়েছি, যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে আটক করবোই এবং তাকে শায়েস্তা করবো। হীরা আজও কোনো পুরুষকে গ্রহণ করেনি, ওর ধ্যান-জ্ঞান সাধনা ঐ দস্যু বনহুর। যতক্ষণ না ওকে বন্দী করে হীরার হাতে সমর্পণ করতে পেরেছি ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই চন্দনা। কথাগুলো বলে থামলো রাণী।

চন্দনার মনেও একটা ভাবময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সে তাকিয়ে আছে রাণীর কঠিন দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে।

অদূরে আওরঙ্গ বসে বসে রাণী আর চন্দনার কথাগুলো শুনছিলো, যদিও সে ওদের কথাবার্তা একবর্ণ ও বুঝতে পারছিলো না!

রাণী বলে উঠে—চন্দনা, আবার আমি কান্দাই যাবো। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর ফিরে গেছে তার আস্তানায়। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

চন্দনা বলে—ততোদিন তুমি প্রদীপ কুমারকে আটক রাখবে রাণী?

এ ছাড়া কোনো পথ নেই চন্দনা। বলে উঠে দাঁড়ালো রাণী। চন্দনাও উঠে পড়লো।

❑

মিঃ হেলালী এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যদিও ডাক্তারের মতে এখনও তাঁর পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন, তিনি তবু কাজে নেমে পড়েছেন। মিঃ হেলালীকে সহায়তা করে চলেছেন আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

সেদিন মিঃ হেলালী পোশাক পরিচ্ছদ পরে তৈরি হয়ে নিচ্ছিলেন এমন সময় একখানা গাড়ি এসে থামলো গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি থেকে নামলো একজন বোরখা পরিহিতা নারী, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। গাড়ি থেকে নেমে সোজা সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

দরজায় মোটা ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে।

বোরখা পরিহিতা দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো—ভিতরে আসতে পারি?

মিঃ হেলালী বললেন—আসুন।

মিঃ হেলালী চোখ তুলতেই চমকে উঠলেন, সম্মুখে একটি বোরখা পরিহিতা মহিলাকে দেখে অবাক হলেন তিনি।

বোরখা পরিহিতা মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে মিঃ হেলালী অবাক কণ্ঠে বললো—মিস দিপালী, আপনি!

হাঁ খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তাই না? বললো দিপালী।

মিঃ হেলালী বললেন—আশ্চর্য হবার কথাই বটে। কারণ মিস দিপালীকে বোরখা পরিহিতা অবস্থায় দেখে বড় নতুন লাগছে। জানিনা হঠাৎ এ অবস্থায় এখানে কি মনে করে?

দিপালী বোরখাটা খুলে ফেলে সোফার একপাশে রাখলো তারপর কক্ষের চার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—আপনি বাইরে বের হচ্ছেন নাকি?

মিঃ হেলালী বললেন—হাঁ একটু বাইরে যাবো। এবার বলুন আপনার সংবাদ কি?

সংবাদ আছে বলেই এসেছি মিঃ হেলালী। বলুন, আজ আপনার শরীর কেমন আছে?

দেখতেই পাচ্ছেন সুস্থ আছি।

কিন্তু ডাক্তার বলেছে আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।

বিশ্রামই তো এতোদিন করে এলাম মিস দিপালী। এখন কাজ করতে হবে। জানেন তো কত কাজ পড়ে আছে। যাক্, বলুন কি সংবাদ?

দিপালী ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বের করে একটি খাম। খামটা বাড়িয়ে ধরে মিঃ হেলালীর দিকে।

মিঃ হেলালী খামটা হাতে নিয়ে বলেন—বসুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন?

দিপালী হেসে বললো—এতোক্ষণে বুঝি অতিথি অভ্যর্থনার কথা স্মরণ হলো?

সত্যি মিস দিপালী, আমি যেন কেমন হয়ে গেছি। আজকাল সব দিক খেয়াল করে চলতে পারি না। ক্ষমা করবেন এ ভুলের জন্য।

দিপালী হাসলো।

মিঃ হেলালী ততোক্ষণে চিঠিখানা খুলে মেলে ধরেছেন চোখের সামনে। চিঠিখানাতে মাত্র কয়েকটা লাইন লেখা আছে—

"মিস দিপালী, আপনি শুধু গাড়িতে
নববধুর বেশে বসে থাকবেন।
গাড়ির ভিতরে থাকবে মালের বাক্স।
লোকে জানবে আপনি শ্বশুরবাড়ি
যাচ্ছেন। কেউ গাড়ির তল্লাশি
করবে না। জিনিস আসল জায়গায়
পৌঁছে গেলেই পাচ্ছেন দশ হাজার
টাকা। রাজি থাকলে জানাবেন?
অন্যথায় বিপদ আছে।"

'ক' 'ন' 'ক'

চিঠিখানা পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মিঃ হেলালী দিপালীর দিকে।

দিপালী বললো—চিঠিখানা আজ রাতে আমার চাকরের হাতে কে যেন দিয়ে গেছে।

আপনি রাজি আছেন কিনা জানিয়েছেন?

জানিয়েছি। এই দেখুন আমার চিঠির নকল কপি।

মিঃ হেলালী খুশি হয়ে হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—ধন্যবাদ। চিঠির নকল কপিটা পড়লেন তিনি, তারপর হেসে বললেন—সত্যি, আপনি বুদ্ধিমতী নারী।

দিপালী বললো—আপনার সহায়তা কামনা করছি।

সহায়তা আমার নয়, আপনার সহায়তাই আমাকে কর্তব্যপথে উদ্বুদ্ধ করবে মিস দিপালী। আচ্ছা, আমি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে রওয়ানা দিচ্ছি, সেখানে মিঃ জাফরীর সঙ্গে কথা হবে।

দিপালী বললো—তাহলে চলি?

হাঁ আসুন, কিন্তু মনে রাখবেন সব কথা।

নিশ্চয়ই রাখবো। দিপালী উঠে দাঁড়ালো।

মিঃ হেলালী চিঠি দুখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো, বললো—চলুন আমার গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দি?

দিপালী হেসে বললে—ধন্যবাদ, কারণ আমি যে আপনার এখানে এসেছি, এ কথা কেউ জানে না। সে বোরখা খানা হাতে তুলে নিয়ে বললে—এটা দেখেই কি আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কেন বোরখা পরে এসেছি।

ও, সে কথা ভুলেই গেছি। আচ্ছা আপনি তাহলে.....

হাঁ, আমি যাচ্ছি। দিপালী বোরখা পরতে পরতে একটু হেসে বললো—সন্ধ্যার পর আবার আসবো।

কিন্তু কেন?

পরে জানতে পারবেন। দিপালী কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো ভেলভেটের মোটা পর্দা ঠেলে বাইরে।

মিঃ হেলালী অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন তার চলে যাওয়া পথের দিকে। সিঁড়িতে দিপালীর জুতোর শব্দ মিশে যেতেই মিঃ হেলালী মাথার ক্যাপটা হাতে তুলে নিয়ে ডাকলেন—শামসু—শামসু...

ছুটে এলো বয়টা—স্যার।

বাইরে যাচ্ছি, কেউ এলে বলবি অল্পক্ষণেই ফিরে আসবো।

আচ্ছা স্যার, বলবো।

মিঃ হেলালী সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান নিচে।

ততোক্ষণে দিপালীর গাড়ি চলে গেছে।

মিঃ হেলালী নিচে নেমে আসতেই তার গভীর নীল গাড়িখানা এসে দাঁড়ালো গাড়ি-বারান্দায়। মিঃ হেলালী চেপে বসলেন।

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

মিঃ হেলালী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন, তারপর আপন মনে ভেবে চললেন তাঁর কাজের কথাগুলো। দিপালীর কিছু পূর্বে দেওয়া চিঠিখানার কথাটা ভাবছিলেন তিনি।

মিঃ হেলালী পুলিশ অফিসে গিয়েই ফোন করলেন মিঃ জাফরীর কাছে.....হ্যালো মিঃ জাফরী, এক্ষুণি একবার পুলিশ অফিসে আসুন, বিশেষ জরুরি আলোচনা আছে।

মিঃ জাফরী সবেমাত্র বাইরে থেকে ফিরে বিশ্রামের আয়োজন করছিলেন, মিঃ হেলালীর ফোন পেয়ে একটু বিরক্ত হলেন বৈকি, তবু বললেন.....আচ্ছা আসছি, আপনি অপেক্ষা করুন।

মিঃ জাফরী বিশ্রাম ত্যাগ করে উঠে পড়লেন।

মিসেস জাফরী ভ্রু কুঁচকে বললেন—এই তো এলে, আবার কোথায় চললে বলো তো?

মিঃ জাফরী বললেন—পুলিশ অফিসে।

তোমার কি একটু বিশ্রাম নেই?

হাসলেন মিঃ জাফরী—বিশ্রাম! আমাদের আবার বিশ্রাম আছে নাকি?

সারাটা জীবন শুধু কাজ আর কাজ নিয়েই থাকবে?

চাকরি করি, কাজ করতেই হবে। তাছাড়া এসব তো আমাদের কর্তব্য।

রেখে দাও তোমাদের কর্তব্য, একদিন তোমাদের বিশ্রাম নেই। এমন কি অসুখ-বিসুখ হলেও একদিন আরাম-বিরাম করবে না?

হেসে বললেন মিঃ জাফরী—আমি তো সুস্থ মানুষ কিন্তু অন্যদের কথা ভাবলে তুমি অবাক হবে বেগম। জানো, আমার কাছে কে এখন টেলিফোন করেছিলো।

তা আমি জানবো কি করে বলো, কে না কে তোমার কাছে ফোন করেছিলো, তুমিই জানো।

মিঃ হেলালী পুলিশ অফিসে বসে আমাকে ফোন করেছেন কোনো জরুরি কাজের ডাক এসেছে, বুঝলে?

মিঃ হেলালী তো অসুস্থ, তাঁকে ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রাম করতে বলেছেন, তবু.....

হাঁ, তবু তিনি কাজে নেমেছেন আর আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর জামকাপড় পরা শেষ হয়ে যায়।

ততোক্ষণে বয় চা এনে টেবিলে রাখে।

মিসেস্ জাফরী চায়ের কাপ তুলে নিয়ে স্বামীর হাতে দেন।

মিঃ জাফরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান সমাধা করে বিদায় গ্রহণ করেন স্ত্রীর কাছে।

মিঃ হেলালী পুলিশ অফিসে বসে মিঃ জাফরীর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ততোক্ষণে অন্যান্য কয়েকজন পুলিশ অফিসার এসে গেছেন।

মিঃ জাফরী আসতেই মিঃ হেলালী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। মিঃ জাফরী আসন গ্রহণ করতেই মিঃ হেলালী বললেন—স্যার, নতুন এক সংবাদ। কট থেকে দিপালীর দেওয়া চিঠিখানা বের করে মিঃ জাফরীর হাতে দিলেন।

মিঃ জাফরী চিঠিখানা পড়ে নিয়ে বললেন—কারা এরা? যারা সুন্দরভোবে কৌশলে প্ল্যান করে কাজ করছে?

এখনও জানতে পারিনি সবকিছু। তবে মিস দিপালী আজই জানাবে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পুলিশ অফিসারদের মধ্যে এসব নিয়ে গভীরভাবে আলাপ-আলোচনা চলে। এরা কারা যারা এমন একটি কৌশল নিয়েছে নববধুর গাড়িতে চোরাই মাল বাইরে পাচার করবে?

নানাভাবে আজকাল চোরাই মাল দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুলিশ মহল টেরও পাচ্ছে না। যারা পাচ্ছে বা পায় তাদের হাতে কিছু গুঁজে দিলেই বেচে যায় ওরা। দেশের এই দুর্নীতি দমনে শপথ গ্রহণ করেছে মিঃ হেলালী। তিনি পুলিশ মহলকে ক্ষমা করবেন না এ ব্যাপারে। মিঃ হেলালী বলেন, দেশকে যারা ভালবাসেন তারা দেশের প্রতিটি জনগণকে ভালবাসেন। জনগণকে ভালবাসলে তাদের মঙ্গল কামনাই হলো জীবনের ব্রত। মিঃ হেলালীর জীবনের ব্রত দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

মিঃ হেলালী মৃত্যুবরণ করবেন তবু শপথ রক্ষা করবেন।

❑

একখানা গাড়ি এসে থামলো দিপালীর বাড়ির সম্মুখে। গাড়ি থেকে নামলো দু'জন ভদ্রলোক। মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত তাদের দেহ।

দিপালী তাদের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলো। ভদ্রলোক দু'জনাকে দেখবামাত্র দিপালী এসে দাঁড়ালো গাড়ির পাশে।

লোক দু'জন দিপালীকে দেখ দীপ্ত হয়ে উঠলো।

একজন বললো—আসুন মিস দিপালী।

অপরজন গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

দিপালী গাড়িতে চেপে বসতেই লোক দু'জন উঠে বসলো তার দু'পাশে।

গাড়িখানা এ-পথ সে-পথ হয়ে ছুটে চললো। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটি হোটেলের সম্মুখে এসে থামলো গাড়িখানা।

লোক দু'জন নেমে দাঁড়ালো।

একজন খুলে ধরলো গাড়ির দরজা—আসুন মিস দিপালী।

দিপালী নামলো।

লোক দু'জন দিপালীকে নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করলো।

সুন্দর মনোরম আবাসিক হোটেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো ওরা তিনজন উপরে।

একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলো তারা তিনজন।

দিপালী তাকিয়ে দেখলো, কক্ষমধ্যে নানারকম সাজসরঞ্জাম। তিনজন বলিষ্ঠ পুরুষ বসেছিলো কক্ষমধ্যে, তাদের চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। দিপালীকে দেখবামাত্র তারা খুশি হয়ে উঠে। সবার চোখেমুখে ফুটে উঠে একা উন্মুখ লালসার ছাপ।

দিপালী চমকে উঠে।

নিজকে সামলে নিয়ে বলে দিপালী—বলুন কি করতে হবে?

এবার যারা কক্ষমধ্যে অপেক্ষা করছিলো তাদের একজন বলে উঠে—আসুন কি করতে হবে আমিই বলে দিচ্ছি।

দিপালী এগিয়ে যায়।

লোক তিনজন ঘিরে দাঁড়ায় দিপালীকে।

একজন বলে—এই শাড়ী-গহনা পরতে হবে। আসুন আমি পরিয়ে দিই?

দিপালী বললো—না, আমি নিজেই পরতে পারবো।

দিপালী কথাটা বলে কাপড় এবং গহনাগুলো তুলে নিলো হাতে তারপর চলে গেলো পাশের ঘরে। একটু পরে শাড়ি-গহনা পরে নববধুর বেশে ফিরে এলো দিপালী।

ততোক্ষণে চার-পাঁচজন লোক চারটি বড় বাক্স এনে রাখলো কক্ষমধ্যে।

দিপালীর সঙ্গী দু'জনকে লক্ষ্য করে বললো কক্ষ মধ্যের বিরাট গোঁফওয়ালা লোকটি—এরা তো কাজ ফাঁস করে দেবে না মিস দিপালী?

দিপালী জিভ কেটে বললো—ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন, এরা আমার বড় আপনজন। আমার হিতাকাঙ্খী বলেই আমি এদের সঙ্গে এনেছি।

আচ্ছা তবে প্রস্তুত?

দিপালী বললো—প্রস্তুত।

চলুন তবে। লোকটা তাদের দলের একজনকে লক্ষ্য করে বললো—মদন, গাড়িতে মালগুলো তুলে দে।

বিপুলদেহী একজন এগিয়ে এলো, সে মালের বাক্সগুলো এক এক করে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এলো।

দলের নেতৃস্থানীয় লোকটা এবার দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো—মিস দিপালী, হঠাৎ যদি পুলিশ গার্ড আমাদের গাড়িখানা ধরে ফেলে তাহলে আপনি ঠিক নববধুর মতোই লজ্জা অবনত মস্তকে মৃদু কণ্ঠে বলবেন, বাক্সগুলোতে আপনার বাপের দেওয়া জিনিসপত্র আছে।

দিপালী বললো—আমাকে এতো বুঝিয়ে বলতে হবে না। এসব আমার অভ্যাস আছে। চলুন এবার কোথায় যেতে হবে? কিন্তু মনে রাখবেন সীমানার বাইরে পৌঁছে দেবার পরই আমার পাওনা আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

নিশ্চয়ই পাবেন মিস দিপালী।

আচ্ছা চলুন। এসো মাধু আর রাসবিহারী! দিপালী নিজের সঙ্গী দু'জনাকে ডাকলো।

ওরা এতোক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো গোবেচারীর মতো। এবার দিপালীকে অনুসরণ করলো।

চোরাচালানীদলের তিনজন এবং দিপালীর সঙ্গী দু'জন সহ পাঁচজন পুরুষ এবং দিপালী একজন নারী—এই ছ'জন গাড়িতে এসে বসলো।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লো।

যে গাড়িতে দিপালী এসেছিলো এ-গাড়ি সে-গাড়ি নয়, এটা চোরাচালানীদের গাড়ি।

গাড়িখানা এগিয়ে চলেছে।

নববধুবেশে গাড়ির মাঝখানে বসে আছে দিপালী। তার সঙ্গীরা সবাই বসেছে পিছন আসনে।

দিপালীর বাক্সগুলো রয়েছে গাড়ির মেঝেতে।

প্রায় ঘন্টা দু'তিন অবিরাম গতিতে চলার পর গাড়িখানা সীমান্তের ধারে এসে পৌঁছলো।

ঐ মুহূর্তে সীমান্তের ওপাশে দেখা গেলো আর একখানা গাড়ি।

দিপালীর সঙ্গী দু'জন বসে আছে সম্মুখ আসনে।

চোরাচালানী তিনজন পিছন আসন থেকে ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিচ্ছিলো এতোক্ষণ। এবার তারা সীমান্তের ওপারের গাড়িখানা দেখে আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে।

একজন বলে—মিস দিপালী, ধন্যবাদ, আজ পথে কোনো পুলিশ বেটা হানা দিয়ে বসেনি।

অপর একজন বললো—এখনও গাড়ির নিকটে না পৌঁছানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।

প্রথম জন বললো—ঐ তো আমাদের ওপারের গাড়ি এসে গেছে।

ড্রাইভার গাড়িখানাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে হাজির করলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও জমাট হয়ে আসেনি।

নেমে পড়লো দিপালীর সঙ্গী দু'জন।

চোরাচালানী তিনজন যেমন গাড়ি থেকে নামতে যাবে, অমনি দিপালীর সঙ্গী দু'জন পকেট থেকে রিভলভার বের করে উঁচু করে ধরলো—খবরদার, গাড়ি থেকে নামবে না।

অপরজন বাঁশীতে ফুঁ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের এপারে থেমে থাকা গাড়ি থেকে নেমে পড়লো বিশজন সশস্ত্র পুলিশ।

দিপালীর সঙ্গীদের একজন বললো—এই তিনজন চোরাচালানীকে গ্রেফতার করো।

দিপালী ততোক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছে গাড়ি থেকে।

পুলিশ ফোর্স চোরাচালানী তিনজনকে টেনে নামিয়ে ফেললো গাড়ি থেকে। ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। ভাবছে ওরা, দিপালী তাহলে আমাদের সঙ্গে চালাকি করলো। পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সে পরামর্শ করেই এসেছিলো।

দিপালী হেসে বললো—দেখুন, আপনাদের অনুরোধ রক্ষা না করে উপায় ছিলো না, কারণ আমাদের নির্দেশ পালন না করলে আপনারা আমাকে বিপদে ফেলতেন তাই.....কথার মাঝপথে থেমে ফিরে তাকালো দিপালী তার সঙ্গী দু'জনার দিকে—মিঃ হেলালী এবং মিঃ জাফরী, আপনারা আমাকে এভাবে সাহায্য করে রক্ষা করলেন, সেজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ হেলালী বললেন—মিস দিপালী, ধন্যবাদ পাবেন আপনি, কারণ আপনার সহায়তায় আজ ক'জন দুষ্কৃতিকারী আটক করা সম্ভব হলো।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—মিস দিপালী, এই নিন আপনার, প্রাপ্য দশ হাজার টাকা। আপনার পুরস্কার।

দিপালী হেসে বললো—পুরস্কার পাবেন আপনারা, আমি নই। আপনাদের সহায়তা ছাড়া আমার একার কোনো উপায় ছিলো না। রেখে দিন ও টাকা, দেশের দুঃস্থ জনগণের সাহায্য তহবিলে দিয়ে দিবেন।

ততোক্ষণে পুলিশ বাহিনী চোরাচালানীদের বন্দী করে ফেলেছে।

চোরাচালানী মালসহ আটক করা হলো দুষ্কৃতিকারী তিন ব্যক্তিকে।

❑

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো আওরঙ্গের। সে দড় বড় বিছানায় উঠে বসলো। সে দেখলো, তার গুহার মেঝেতে একটা নীলাভ আলোক রশ্মির আভা ছড়িয়ে পড়েছে। বিস্মিত আওরঙ্গ চিৎকার করতে যাবে অতি কষ্টে সে নিজকে সামলে নিলো। অবাক হয়ে আলোকরশ্মির দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো আওরঙ্গ। সে যে কক্ষমধ্যে ঘুমাতো সেটি আসেলে কোনো কক্ষ নয়, ছোট একটি গুহা। গুহাটির কোনো দরজায় কোনো ঢাকনা বা আবরণ ছিলো না।

আওরঙ্গ দাঁড়াতেই দেখলো, অদূরে একটি ছোট যান দাঁড়িয়ে আছে আর সেই যান থেকে নীলাভ আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে। সে দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে সেই বিস্ময়কর যানটির দিকে।

আরও অভিভূত হয়ে যায় আওরঙ্গ, সে দেখতে পায় শুভ্র বসনা এক নারী মূর্তি এসে দাঁড়ায় যানটির পাশে।

তার পিছনে সিমকী এবং আরও কয়েকজন পুরুষ এগিয়ে আসে। পুরুষগুলোর দেহে জমকালো এক অদ্ভুত ধরনের পোশাক। শুভ্রবেশী নারীকে চিনতে পারে আওরঙ্গ, তাকে সেদিন সে দেখেছিলে সিমকার সঙ্গে ঝরণার ধারে। নির্বোধের মতো দেখে সে তাকিয়ে তাকিয়ে।

শুভ বসনা নারীমূর্তিকে নত হয়ে অভিবাদন জানায় তার অনুচরগণ।

নারীমূর্তিকে লক্ষ্য করে বলে সিমকী—তোমার যাত্রা যেন শুভ হয়।

রাণী সিমকীকে লক্ষ্য করে বলে—সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো চন্দনা। ফিরে না আসা অবধি আস্তানার বাইরে যাবে না।

রাণী সেই অদ্ভুত যানে আরোহণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে যানখানা ভেসে উঠলো আকাশে। অদ্ভুত সে যানটি, কোনোরকম শব্দ হচ্ছে না। যানখানা আকাশে নীলাভ আলোর কিঞ্চিৎ আভা ছড়িয়ে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আওরঙ্গ হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো আকাশের দিকে।

এমন সময় কেউ যেন ওর কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো আওরঙ্গ।

কখন যে মদন এসে তার কাঁধে হাত রেখেছে বুঝতে পারেনি সে। আওরঙ্গকে ফিরে তাকাতে দেখে বলে মদন—হা করে কি দেখছো চাচা?

এ্যাঁ, কি বললে? আওরঙ্গ যেন থতমত খেয়ে গেছে।

মদন বললো—ভয় নেই, আমাদের রাণীজী তার আস্তানায় গেলেন।

আস্তানা! কিসের আস্তানা মদন বাবাজী?

বোকা বুড়ো জানে না দস্যুরাণীর আস্তানা আছে।

কেন, দস্যুরাণীর এটাই তো আস্তানা?

না; এটা ছাড়া পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে তার আসল আস্তানা আছে। রাণীজী সেখানেই থাকেন।

জানো চাচা, রাণী এবার কেন এসেছিলেন?

তা আমি জানবো কি করে?

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন তিনি।

দস্যু বনহুর!

হাঁ তাকে চেনো না?

আমি—আমি দস্যু বনহুরকে চিনবো কি করে?

সে অনেক বড় দস্যু, বুঝলে? তাকে আমাদের রাণীজী বন্দী করেছেন।

সত্যি বলছো মদন বাবা?

হাঁ, তা নয়তো কি মিথ্যা বলছি!

দস্যু বনহুর কেমন দেখতে?

মানুষের মতো।

তাতো বুঝলাম কিন্তু কেমন তার চেহারা তাই বলছি। খুব বুঝি ভয়ঙ্কর দেখতে?

হেসে উঠলো মদন—দস্যু হলেই বুঝি খুব ভয়ঙ্কর চেহারার লোক হয়?

তাই তো আমি মনে করি।

আমাদের রাণীজীকে দেখেছো—তিনি তো দস্যুরাণী কিন্তু কতো সুন্দর তার রূপ-যৌবন, যেন অপূর্ব। তেমনি দস্যু বনহুর। কি সুন্দর তার চেহারা, যেন রাজপুত্র।

মদন বাবাজী, আমাকে একবার তাকে দেখাবে? বড় সাধ আমার দস্যু বনহুরকে একবার স্বচক্ষে দেখি।

এই সখ তোমার?

হাঁ মদন বাবা।

এসো আমার সঙ্গে।

এতো রাতে?

তাতে কি আসে যায়। আমাদের আস্তানায় রাত এবং দিন সব সমান, চলো।

আচ্ছা চলো মদন রাবাজী।

মদন এগুলো, তাকে অনুসরণ করলো আওরঙ্গ। জমাট অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। মদনের হাতে একটি মোমবাতি।

মোমের আলোতে সামান্য পথ নজরে পড়েছিলো, কেমন যেন বিভীষিকাময় লাগছিলো আওরঙ্গের কাছে। সে চিরদিন মুক্ত আলো-বাতাসে সমুদ্রবক্ষে কাল কাটিয়েছে, এমন জায়গাতো আর সে দেখেনি কোনোদিন। বারবার হোঁচট খাচ্ছিলো, দেয়ালের সঙ্গে মাথাও ঠুকে গেলো কয়েকবার।

মদন বললো—কি বুড়ো চাচা, দস্যু বনহুরকে দেখবার সখ তবু আছে?

হাঁ বাবা দেখবো। এতোবড় একটা দস্যুকে তোমাদের রাণীজী বন্দী করেছেন আমি দেখবো না? দেখবো চলো।

অনেকটা সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে এক সময় এসে পৌছে গেলো তারা লৌহ কারাকক্ষের সম্মুখে।

আওরঙ্গের চক্ষুস্থির, ভূগর্ভে এমন কারাকক্ষ সে দেখেনি কোন দিন বিস্মিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আওরঙ্গ হা করে।

মদন বলে— কি দেখছো ঐ যে ভিতরে তাকাও দস্যু বনহুরকে দেখতে পাবে।

মদনের কথায় আওরঙ্গ তাকায় কারাকক্ষের ভিতরে, চমকে উঠে আওরঙ্গ, সে দেখতে পায় এক যুবক মাথার নিচে বাহু রেখে ঘুমাচ্ছে। কারাকক্ষের স্বল্প আলোতে যুবকের চেহারাখানা স্পষ্ট নজরে পড়ে।

আওরঙ্গ কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

মদন ঠোঁটে আংগুল চাপ দিয়ে বলে উঠে চুপ। কথা বলো না

আওরঙ্গের কিছু বলা হয় না, সে নির্বাকভাবে তাকিয়ে থাকে কারাকক্ষের ঘুমন্ত বন্দীর মুখের দিকে।

মদন বলে—কি দেখছো অমন হা করে?

দেখছি দস্যু বনহুরকে.....

হাঁ দেখো আমাদের রাণী কত বড় বীর রমণী যার অসাধ্য কিছু নেই।

তাইতো দেখছি।

দু'জন প্রহরী এতোক্ষণ বসে ঝিমুচ্ছিলো তারা সজাগ হয়ে উঠে। একজন বলে বসে—কে রে?

মদন এক মুখ হেসে বলে—আমরা।

তোমরা এখানে কেনো?

মদন জবাব দেয়—আমরা বন্দীকে দেখতে এসেছি।

তোমার সঙ্গী কে?

আওরঙ্গ চাচা।

ও বুড়োর আবার বন্দী দেখার সখ।

দস্যু বনহুরকে সে দেখেনি কোনোদিন তাই।

বেশ করেছো এবার চলে যাও।

কথাবার্তায় জেগে উঠেছে বন্দী। সে উঠে বসে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। নিদ্রাজড়িত দু'টি চোখ ঢল ঢল করছে বন্দীর।

আওরঙ্গ স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

বন্দী শয্যা ত্যাগ করে উঠে এলো লৌহশিকের পাশে। আওরঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলো সি স্থির দৃষ্টি মেলে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো আওরঙ্গ। তার দু'হাতে দু'টি ক্ষুদ্রাকৃতি আগ্নেয় অস্ত্র। বললো সে—খবরদার, এক পা নড়বে না।

মদন এবং প্রহরীদ্বয় আচমকা আওরঙ্গকে রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে দেখে হকচকিয়ে গেলো। প্রহরীদ্বয় তাদের হস্তস্থিত অস্ত্র উঁচু করবার সুযোগ পেলো না। তারা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

আওরঙ্গ বজ্রকঠিন কণ্ঠে বললো—হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।

মদন বললো—আওরঙ্গ তুমি.....

পরে সব শুনবে, এবার আমার কথা মতো কাজ করো, না হলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রহরীর নিকট থেকে চাবি নাও খোলো বন্দীশালার দরজা। যাও—তাকিয়ে আছো কেন।

মদন প্রথম প্রহরীর নিকট থেকে চাবি নিয়ে খুলে ফেলে লৌহ কারাগারের দরজাটা।

আওরঙ্গ বলে এবার—অস্ত্র ফেলে দাও প্রহরীদ্বয়। দাও বলছি...

বাধ্য হলো ওরা হাতের অস্ত্র ফেলে দিতে।

আওরঙ্গ বললো—মদন, প্রহরীদ্বয় সহ বন্দীশালায় প্রবেশ করো, নাচেৎ.....অস্ত্র দুটি ঠিকভাবে উঁচু করে ধরে কথাটা অর্ধসমাপ্ত ভাবে শেষ করে সে।

মদন এবং প্রহরীদ্বয় যত সাহসীই হোকনা কেনো, তারা আওরঙ্গের হস্তস্থিত ক্ষুদ্র অস্ত্র দুটির দিকে তাকিয়ে একেবারে দমে গেছে যেনো। মদন ভাবতে পারেনি বৃদ্ধা আওরঙ্গ এমনভাবে তাদের পরাজিত করতে পারবে। ওরা ভিজে বিড়ালের মতো বন্দীশালায় প্রবেশ করে। মদন দাঁতে অধর দংশন করতে লাগলো।

প্রদীপ কুমার বন্দীশালার মধ্যে থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। বৃদ্ধ লোকটা কে? আর কেনই বা সে এভাবে এখানে এসেছে? কি এর উদ্দেশ্য?

ততোক্ষণে আওরঙ্গ প্রহরীদ্বয়ের ফেলে দেওয়া অস্ত্রগুলো পা দিয়ে সরিয়ে ফেলে, তারপর বলে উঠে সে—প্রদীপ কুমার, বেরিয়ে আসুন।

বেরিয়ে আসুন আপনি.....

প্রদীপ কুমার অবাক না হয়ে পারে না, কে এই ব্যক্তি যে তার নামটাও জানে। বেরিয়ে আসে প্রদীপ কুমার দ্রুত পদক্ষেপে কারাকক্ষ থেকে।

আওরঙ্গ মূহূর্তের জন্যও নিজের হস্তস্থিত ক্ষুদ্র আগ্নেয় অস্ত্র দুটো নত করে নিল। সে এবার অস্ত্র দুটি জামার পকেটে রেখে নিজের হাতে লৌহ কারাকক্ষের তালা বন্ধ করে ফেললো।

মদন বললো—আওরঙ্গ, তোমার মনে এতো শয়তানি ছিলো..... দাঁতে দাঁত পিষতে থাকে সে।

আওরঙ্গ বললো—চললাম মদন বাবাজী। তারপর প্রদীপ কুমারকে লক্ষ্য করে বললো—আসুন রাজকুমার।

❑

মুক্ত আকাশের কুলে এসে দাঁড়ালো আওরঙ্গ আর প্রদীপ কুমার। উপরে আকাশ, নিচে প্রান্তর, সম্মুখে সীমাহীন শূন্যতা। ভোর হয়ে এসেছে, শুকতারা ঝকমক করছে!

প্রদীপ কুমার বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলো, কারণ বহুদিন বন্দী থাকায় তার দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। সুড়ঙ্গ পথে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে ওরা। আওরঙ্গ বললো—রাজকুমার এবার আপনি বিশ্রাম করুন।

প্রদীপ কুমারের ললাটে ফুটে উঠেছিলো বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাতের পিঠে ঘাম মুছে ফেললো, তারপর বসে পড়লো সে ঘাসের উপর।

আওরঙ্গও বসলো ওর পাশে।

প্রদীপ কুমার একটু বিশ্রাম করার পর আওরঙ্গকে লক্ষ্য করে বললো—কে তুমি বন্ধু আমাকে এভাবে উদ্ধার করলে? বলো কে তুমি?

আওরঙ্গ একমুখ হেসে বললো—আমি আওরঙ্গ।

না তুমি আওরঙ্গ নও, তুমি.....

বলো, থামলে কেনো?

তুমি নিশ্চয়ই সেই.....

## পরবর্তী বই
## দস্যুরাণীর কবলে দস্যু বনহুর

দস্যুরাণীর কবলে দস্যু বনহুর— ৭৪

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

# দস্যু বনহুর

❑

তোমার অনুমান মিথ্যা নয় বন্ধু, আমিই সেই যার জন্য তোমার ভাগ্যাকাশে বারবার দুর্যোগের ঘনঘটা ঘনিয়ে এসেছে, অনেক কষ্ট ভোগ করেছো। এ জন্য আমি অপরাধী। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে থামলো আওরঙ্গবেশী দস্যু বনহুর।

প্রদীপ কুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো দস্যু বনহুরের মুখের দিকে, সে ঐ মুখখানাকে ভাল করে দেখতে চাইলো। কিন্তু একমুখ দাড়ি গোঁফে ঢাকা সেই মুখখানা। বললো এবার প্রদীপ কুমার—জানতাম তুমি আমাকে একদিন না একদিন উদ্ধার করবে। তোমার প্রতীক্ষায় আমি প্রহর গুণতাম বন্ধু।

বনহুর একটু হাসলো।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর উঠে দাঁড়ালো বনহুর, বললো— এবার চলো বন্ধু, উঠতে হবে।

প্রদীপ কুমার আর দস্যু বনহুর সম্মুখে এগুতে লাগলো।

উচুনীচু পাহাড়িয়া পথে দু'জন এগিয়ে চলেছে।

বনহুর ইচ্ছা করেই আওরঙ্গের ছদ্মবেশ ত্যাগ করেনি, কারণ উভয়ের চেহারা এক হওয়ায় দ্বিধা এলো মনে। মস্থনা রাজ্যের জনগণ রাজকুমার প্রদীপকে ভালভাবেই চেনে, কাজেই তারা যেন দু'জনকে একই রকম দেখে চমকে না যায় বা নতুন কোনো বিভ্রাট না ঘটে।

এদিকে কারাগারে নিজেদের সঙ্গীদের বন্দী অবস্থায় দেখে দস্যু রাণীর অন্যান্য অনুচর বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো, তারা ছুটলো চন্দনার কাছে।

চন্দনা সবেমাত্র সুখনিদ্রা ত্যাগ করে উঠতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে এসে দাঁড়ালো দু'জন অনুচর।

একজন ব্যস্তকণ্ঠে বললো—চন্দনা দিদি, সর্বনাশ হয়ে গেছে। সর্বনাশ হয়ে গেছে...

চন্দনা চোখ রগড়ে বিস্মিতকণ্ঠে বললো—সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ?

ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বললো আর একজন।

চন্দনা রাগতঃ কণ্ঠে বললো—কি হয়েছে বলো না?

দস্যু বনহুর পালিয়েছে।

চন্দনা লাফ দিয়ে নিচে নেমে পড়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে—বলো, কি, দস্যু বনহুর পালিয়েছে!

হাঁ চন্দনা দিদি! চলো দেখবে চলো, দস্যু বনহুর মদন আর বন্দী শালার প্রহরীদ্বয়কে কারাকক্ষে বন্দী করে রেখে পালিয়েছে।

বলো কি?

সত্যি চন্দনা দিদি, গিয়ে দেখ।

চন্দনা অনুচরদের সঙ্গে রওনা দিলো কারাকক্ষের দিকে।

কারাকক্ষে বন্দী পৌঁছে চন্দনার চক্ষুস্থির। মদন এবং দু'জন প্রহরী কারাকক্ষে বন্দী অবস্থায় হা করে দাঁড়িয়ে আছে। এক এক জনের মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

চন্দনা বলে উঠে—কি করে তোমরা কারাকক্ষে গেলে, বলো?

মদন বললো—আগে আমাদের কারাকক্ষ থেকে বের করে নাও, সব বলছি।

চন্দনা বললো—না না মুক্তি নয়, ঐ বন্দীশালায় থেকেই সব বলতে হবে। কেমন করে তোমরা বন্দীশালায় প্রবেশ করলে আর বন্দী কি করে বন্দীশালা থেকে পালালো?

মদন প্রায় কেঁদে ফেললো—চন্দনা দিদি, আমার কোনো দোষ নেই, ঐ আওরঙ্গের যত দোষ.....

চমকে উঠলো চন্দনা—আওরঙ্গ! কোথায় সেই বৃদ্ধ?

মদন বলে উঠে— ঐ আওরঙ্গই তো আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো বন্দীশালায়। আমি কি তখন জানতাম সে এমন সর্বনাশ করবে। চন্দনা দিদি, তোমাকে কি বলবো সে কথা!

চন্দনা ক্রুদ্ধ বিস্মিত, চিৎকার করে বললো—কোথায় সেই আওরঙ্গ?কি বলছো তুমি মদন, খোলাসা করে বলো?

মদন আওরঙ্গের সঙ্গে এখানে আসার পর যে ঘটনা ঘটেছিলো, সব খোলাসা চন্দনার কাছে বললো। চন্দনার চোখ দুটো যেন ছানাবড়া হয়ে গেছে। সহসা তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। নিজকে সামলে

নিয়ে বললো চন্দনা—আওরঙ্গ! আওরঙ্গের শরীরে এতো শক্তি! সে তাহলে ন্যাকামি করে দুর্বল সেজে থাকতো?

মদন বললো—হাঁ চন্দনা দিদি, বুড়ো হলে কি হবে, আওরঙ্গ ভীষণ শক্তিশালী।

চন্দনা বললো—সে যে শক্তিশালী সে কথা কেমন করে বুঝলে? সে তোমাদেরকে অস্ত্র দ্বারা কাবু করে ফেলেছিলো?

না চন্দনা দিদি, লোকটার কথাবার্তায় তার দেহ যে শক্তিশালী তা বেশ বোঝা যাচ্ছিলো। তুমি যা মনে করছো আসলে তা নয়। আওরঙ্গ জোয়ারের চেয়েও শক্তিবান।

চন্দনা তখন ভাবছে, আওরঙ্গকে সে-ই নিয়ে এসেছিলো শাহান শাহ জাহাজ থেকে। আওরঙ্গকে সে বিশ্বাস করেছিলো একান্তভাবে। এভাবে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। কিন্তু এমন শক্তিহীন এক বৃদ্ধ যে এমনভাবে সর্বনাশ করবে ভাবতে পারেনি সে কোনো সময়। চন্দনা নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো। রাণী এলে সে কি জবাব দেবে? বন্দী প্রদীপ কুমারকে নিয়ে আওরঙ্গ যে এভাবে উধাও হবে, ভাবতেও পারেনি সে।

চন্দনা যখন দিশেহারার মত ভাবছে তখন রহমত এসে হাজির।

কথাটা রহমতের কানে যেতেই গম্ভীর হয়ে পড়লো। সোজা সে এসে হাজির হলো চন্দানার কাছে।

চন্দনা বিপদগ্রস্তের মত বললো—রহমত, এখন কি উপায় বলো? সব তো শুনেছো?

হাঁ শুনলাম। চন্দনা, তুমি জানো বা জানতে বাইরের কোনো লোককে আস্তানায় নিয়ে আসা অপরাধ। তুমি যে ভুল করেছিলে তার পরিণতি কি হবে কে জানে! আজই রাণীর কাছে সংবাদ জানিয়ে দাও। রহমত কথাগুলো বলে চন্দনার দিকে তাকালো।

চন্দনার মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠেছে। সে নিরুপায়ের মত তাকায় রহমতের দিকে।

রহমত বুঝতে পারে, চন্দনা তার ভুলের জন্য ভীষণভাবে অনুতপ্ত, দুঃখিত, লজ্জিত।

❑

মন্থনার কারাগার থেকে দস্যু বনহুর পালিয়েছে, সংবাদটা ওয়্যারলেসে শোনামাত্র দস্যুরাণী ক্ষিপ্তের মত হয়ে উঠলো। অনুচর রঘুকে লক্ষ্য করে বললো—এক্ষুণি আমি মন্থনায় রওনা দেবো। পাম্পিং সসার প্রস্তুত করো।

রঘুনাথ মাথা নত করে বললো—যাচ্ছি রাণীজি।

বেরিয়ে গেলো রঘুনাথ।

দস্যুরাণী পায়চারী করতে লাগলো। দস্যুরাণীর শরীরে জমকালো পোশাক। পোশাকটা মশালের আলোতে চক্ চক্ করছে। পায়ের বুটে শব্দ হচ্ছে খট্ খট্ খট্।

এমন সময় দস্যুরাণীর একজন অনুচর এসে একখানা চিঠি দিলো —রাণীজী চিঠি।

দস্যুরাণী চিঠিখানা মেলে ধরলো চোখের সম্মুখে। চিঠিতে লিখা আছে—

রাণী, আমি ঝিন্দে যাচ্ছি। যদি
সময় পাও তবে ঝিন্দে এসো, জরুরি
কথা আছে।
—মিঃ চৌধুরী

চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ করে রেখে দিলো টেবিলে। তারপর লোকটাকে লক্ষ্য করে বললো—এ চিঠি কে তোমাকে দিলো মসিয়ে?

একটা লোক! লোকটা রায়হান থেকে এসেছে জানালো।

গর্জন করে উঠলো দস্যুরাণী—সে কি করে আমার এই আস্তানার সন্ধান পেলো?

আমরা কেমন করে জানবো রাণীজী!

তাকে আটক করেছো?

হাঁ।

নিয়ে এসো আমার সম্মুখে।

মসিয়ে চলে গেলো!

দস্যুরাণী মুখের আবরণ টেনে দিলো।

একটু পরেই ফিরে এলো মসিয়ে, সঙ্গে তার একটি লোক। লোকটার হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা। লোকটা মোটেই ঘাবড়ে যায়নি তার চোখ মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারে দস্যুরাণী।

দস্যুরাণী লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখে খিল খিল করে হেসে উঠে, তারপর হাসি থামিয়ে বলে—দস্যুরাণীকে কুর্ণিশ জানাতে হয়, এ কথাও বলে দিতে হবে?

লোকটা দস্যুরাণীর দিকে তাকিয়ে রইলো শুধু, কোনো জবাব দিলো না।

দস্যুরাণী বললো—বলুন কি করে আপনি আমার আস্তানার পথ চিনে নিলেন সমীর কুমার বাবু?

এবার লোকটা বলে উঠে—চিনতে পেরেছো তাহলে রাণী?

হাঁ, আপনার ছদ্মবেশে নিখুঁত নয় সমীর কুমার বাবু। শুনুন, আপনার বন্ধুকে বলবেন আমি মন্থনায় যাচ্ছি। দস্যু বনহুর আমার মন্থনা কারাগারে আবদ্ধ ছিলো, সে ঐ কারাগার থেকে পালিয়েছে। ঝিন্দে সময়মত যাবো।

আচ্ছা রাণী, বলবো।

কিন্তু আপনি নিজে না এলেই পারতেন।

না এলে বন্ধু রাগ করতো, তাই.....

বুঝেছি, আপনার বন্ধুর চেয়ে আপনার গরজটাই যেন বেশি মনে হচ্ছে। যাক, আজ এখানে কাটিয়ে কাল সকালে যাবেন।

না রাণী, আজই আমাকে রওনা দিতে হবে। আমার বাহন সীমান্তে অপেক্ষা করছে।

দস্যুরাণী বললো—খাওয়া-দাওয়া করে তবেই রওনা দেবেন কুমার বাবু।

তাতে আমার অমত নেই। এতটা পথ এসেছি ক্ষুধাও পেয়েছে। সমীর খুশি হয়ে কথাগুলো বলে।

দস্যুরাণী মসিয়েকে লক্ষ্য করে বললো—মসিয়ে, ইনি প্রখ্যাত গোয়েন্দা আহাদ চৌধুরীর অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ সমীর কুমার। এঁর যেন কোনো অসম্মান না হয়। এঁকে নিয়ে যাও, আমার খাবার টেবিলে বসিয়ে খাওয়াবে।

নতমস্তকে অভিবাদন জানিয়ে বলে মসিয়ে—আচ্ছা রাণীজী।

সমীর কুমারও একটু হেসে দস্যুরাণীকে অভিবাদন জানায়।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয় রঘুনাথ—রাণীজী, সসার প্রস্তুত।

আচ্ছা চলো।

দস্যুরাণী এবং রঘুনাথ এসে দাঁড়ায় আস্তানার এক প্রান্তে, যেখানে পাম্পিং সসার অপেক্ষা করছিলো।

দস্যুরাণী সসারে চেপে দাঁড়াতেই সসার উড়ে উঠে আকাশে। রাত্রির অন্ধকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে একটা নীলাভ আলোকরশ্মি।

রঘুনাথ হাত নাড়তে থাকে।

উড়ন্ত সসার উড়ে চলে আকাশে।

রঘুনাথ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলো, সসারটা মুহূর্তে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ফিরে চলে রঘুনাথ।

❑

সমীর কুমারকে ততক্ষণে রাণীজীর টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।

সমীর খাবার টেবিলে বসে অবাক হয়ে দেখছে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ভূগর্ভে এমন বিশাল কক্ষ সে কোনোদিন দেখেনি। কক্ষ গুলো জমকালো পাথরে তৈরি। মাঝে মাঝে বেলোয়াড়ী ঝাড় ঝুলছে। ঝাড়ে মোমের আলো জ্বলছে। কয়েক হাতে দূরে দূরেই দেয়ালে ঢাল তলোয়ার আটকে রাখা হয়েছে। বর্শা-বল্লম আর তীর ধনুও আছে। আছে রাইফেল-বন্দুক আর হালকা মেশিন গান।

সমীর খেতে বসে আরও অবাক হলো, টেবিলে রুচিসম্মত খাবার থরে থরে সাজানো।

সমীর কুমার আসলে পেটুক মানুষ, খাবার দেখে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। হাপুস হুপুস খেয়ে নেয় সে যত পারে তারও কিছুটা বেশি।

রাণীজীর টেবিল। অবাক হয়ে দেখে সমীর কুমার। এমন টেবিল কোনোদিন দেখেনি। আবলুস রঙের টেবিল, যেন আয়নার মত দাঁত মুখ দেখা যায়। টেবিলের চারপাশে মূল্যবান চেয়ার। যে চেয়ারে রাণী বসে সে চেয়ারখানা সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো।

পা রাখার জন্য একটি পাদানী। সেটাও রৌপ্যের তৈরি, ঠিক যেন একটি ফুটন্ত পদ্মফুল। বড় সুন্দর মনোরম কক্ষ সেটা, সমীর কুমার দেখে শুধু হতবাকই হয় না, একেবারে নির্বাক হয়ে যায় যেন।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিদায় নিলো সমীর কুমার। দস্যুরাণী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে মন্থনায়। পাম্পিং সসারের গতি ছিলো ঘন্টায় হাজার হাজার মাইল। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্থনায় পৌঁছে দস্যু রাণী তার অনুচরদের ডাকলো।

দস্যুরাণী কঠিন কণ্ঠে বললো—তোমরা এতবড় অপদার্থ যার জন্য আমাদর কারাগার থেকে দস্যু বনহুর পালাতে সক্ষম হলো। আমার নির্দেশ যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে না আনতে পারো তাহলে সবাইকে আমি চরম শাস্তি দেবো।

দস্যুরাণী অনুচরদের আদেশ দিয়ে ফিরে এলো তার নিজ দরবার-কক্ষে। সেখানে চন্দনা এবং কয়েকজন অনুচর ছিলো।

চন্দনার মুখে কোনো কথা নেই, সে নতমস্তকে দাঁড়িয়েছিলো কক্ষের একপাশে।

দস্যুরাণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই চন্দনাকে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায়। দস্যুরাণী জানতে পেরেছিলো; চন্দনা যে বৃদ্ধ সারেঙ্গ আওরঙ্গকে জাহাজ শাহানশাহ থেকে নিয়ে এসেছিলো, সেই বৃদ্ধই কারাগার থেকে দস্যু বনহুরকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে এবং বন্দী করে রেখে গেছে যারা কারাকক্ষটিকে পাহারা দিচ্ছিলো তাদেরকে।

কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে পড়েছিলো দস্যুরাণী। চন্দনার ভুলের জন্যই যে এমন একটা অঘটন ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে দস্যুরাণী থমকে দাঁড়ালো। তারপর আসনে উপবেশন করে ডাকলো—চন্দনা!

চন্দনা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো, সে দৃষ্টি তুলে তাকাবার সাহস করলে না।

দস্যুরাণী এবার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—যে ভুল তুমি করেছো চন্দনা, জানো তার শাস্তি কি?

চন্দনা এবার ভীত দৃষ্টি তুলে তাকালো দস্যুরাণীর মুখের দিকে। দস্যুরাণীকে সে তার সঙ্গে এমন কঠিনভাবে কোনোদিন কথা বলতে দেখেনি বা শোনেনি। ঢোক গিলে কিছু বলতে চেষ্টা করলো চন্দনা কিন্তু তার শুষ্ক কণ্ঠ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।

দস্যুরাণী এগিয়ে এলো কয়েক পা চন্দনার দিকে। ওর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

কক্ষমধ্যে কয়েকজন অনুচর দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা চোখ তুলে তাকাবার সাহস পাচ্ছিলো না। দস্যুরাণীর বুট পরা পা দু'খানার দিকে মাঝে মাঝে তাদের দৃষ্টি এসে পুনরায় ফিরে যাচ্ছিলো নিজ নিজ চরণ যুগলে।

দস্যুরাণীর কথায় অনুচরদের মুখ বিবর্ণ হলো, তারাও মনে মনে শিউরে উঠলো।

দস্যুরাণী বললো—চন্দনা, তুমি আমার বিনা অনুমতিতে বাইরের একজনকে আস্তানায় নিয়ে এসে যে অপরাধ করেছিলে তার শাস্তি তোমার মৃত্যুদণ্ড।

রাণী!

হাঁ, যদিও তুমি আমাকে কথাটা পরে বলেছিলে তবু তোমার অপরাধ অখণ্ডনীয়। কারণ তখন তুমি ভুল করে বসেছো। দস্যুরাণী কথাটা বলে বেরিয়ে যায় দ্রুত দরবারকক্ষ থেকে।

নিজের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে একটা শূন্য আসনে উপবেশন করে দস্যুরাণী।

কতক্ষণ কেটে যায়।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে রহমত।

দস্যুরাণীকে অভিবাদন জানিয়ে বলে—রাণীজী।

বলো কি বলতে চাও?

চন্দনার জন্য কি মৃত্যুদণ্ডই শ্রেয়?

হাঁ রহমত।

কিন্তু.....

কোনো কিন্তু নয়—যাও রহমত, তিন দিন ওকে কারাগারে বন্দী রেখে চতুর্থ দিনে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করবে।

রাণীজী!

যাও রহমত, আর কোনো কথা নয়।

রহমত একবার রাণীর মুখ অসহায় করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

❑

সর্দার।

কে রহমান?

হাঁ।

কি সংবাদ?

দস্যুরাণী তার বান্ধবী এবং সহচরী চন্দনা নামক এক তরুণীর মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছে। আর অন্যান্য অনুচরকে কারাকক্ষে বন্দী রেখে তাদের বেত্রাঘাত করা হচ্ছে।

চন্দনা নামক তরুণীই আমাকে দস্যুরাণীর আস্তানায় নিয়ে গিয়েছিলো, ঐ তরুণীরই নাম ছিলো সিমকী। রহমান, এই তরুণী যাতে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত হতে না পারে, এজন্য আমাকে পুনরায় মনস্থ যেতে হবে। তার পূর্বে আমি একবার মিঃ হেলালীর সঙ্গে দেখা করার মনস্থ করেছি।

সর্দার, আদেশ করুন কি করতে হবে?

তাজকে প্রস্তুত করো।

বেরিয়ে যায় রহমান।

বনহুর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে নূরী। মুখোভাব গম্ভীর করে বলে নূরী—শুনলাম আবার তুমি মস্থনায় যাচ্ছো?

বনহুর কোটটা গায়ে পরতে পরতে বলে—হাঁ নূরী।

হুর, মন্থনায় গেলে এবার তোমার বিপদ ঘটবে। কথাটা কঠিন কণ্ঠে বললো নূরী।

বনহুর ফিরে তাকালো নূরীর মুখে, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হাসি থামিয়ে বললো—বিপদ। হুঁম্ বিপদ! বিপদে পড়বে বলে মন্থনায় যাবো না?

নূরী বলে—দাইমা বলেছে, এবার তোমার যাত্রা শুভ নয়।

মিথ্যে কথা।

হুর, তুমি কিচ্ছু বিশ্বাস করোনা। দাইমা বৃদ্ধা সে সব জানে, বুঝতে পারে তা ছাড়া আমাদের মায়ের সমতুল্য.....

জানি নূরী কিন্তু এবার আমাকে যেতেই হবে। দস্যুরাণী এক অসহায় রমণীকে অহেতুক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। তাকে বাঁচাতে হবে, বুঝলে?

অবাক কণ্ঠে বললো নূরী—দস্যুরাণী! কে সেই দস্যুরাণী?

নূরী, তাকে তুমি চিনবে না, কারণ আমি নিজেও তাকে জানতাম না। সে এক গর্বিতা নারী, সে মনে করে তার মত বীরাঙ্গনা নারী আর কেউ এ পৃথিবীতে নেই।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে নূরী—রাণী দুর্গেশ্বরী ছিলো এক গর্বিতা নারী, সেও নিজকে অনেক বড় মনে করতো।

এই দস্যুরাণী তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালিনী নারী, যার নাম স্মরণে পৃথিবীর এক অংশের জনগণ ভয়ে কম্পমান হয়।

সত্যি?

হাঁ।

তুমি তাকে দেখেছো?

তার বন্দীশালা থেকে প্রদীপ কুমারকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছি। তাকেও ইচ্ছা করলে বন্দী করতে পারি। কিন্তু.....

কিন্তু কি, বলো থামলে কেন?

তাকে বন্দী করতে চাই না। নূরী, দস্যুরাণীর একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে।

কি কাহিনী বলবে?

শুনেছি দস্যুরাণীও নাকি তোমার মত এক দস্যুকন্যা।

নূরী বলে উঠে—দস্যুরাণী দস্যুকন্যা হবে এতে আর অবাক হবার কি আছে?

কিন্তু আসলে সে দস্যুকন্যা নয়।

দস্যুরাণী দস্যুকন্যা নয়?

না। সেই তো এক অদ্ভুত কাহিনী।

সে কাহিনী তুমি জানলে কি করে?

আওরঙ্গের বেশে আমি যখন দস্যুরাণীর মন্থনা আস্তানায় ছিলাম তখন একদিন মদন নামক এক অনুচর আমাকে দস্যুরাণীর জীবন কাহিনী শুনিয়েছিলো। দস্যুরাণীর নাম হলো মিস হেনরী। দস্যু মরেন তাকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছিলো।

দস্যু মরেন?

হাঁ, সে ছিলো জাতিতে খ্রিস্টান। সে নাকি জলদস্যুদলের দলপতি ছিলো। একদিন একটি যাত্রীবাহী জাহাজে হানা দিয়ে তার অনুচরগণ যখন যাত্রীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে চলেছিলো তখন কোনো এক ক্যাবিনে ছিলো হেনরীর বাবা এবং মা। মার সমস্ত দেহে ছিলো মনিমুক্তাখচিত অলঙ্কার। মরেনের অনুচরগণ হেনরীর মাকে আক্রমণ করলে তার বাবা স্থির থাকতে পারে না। সে স্ত্রীকে উদ্ধার আশায় এগিয়ে যায় কিন্তু পারে না স্ত্রীকে রক্ষা করতে, নিহত হয় সে মরেনের অনুচরদের হাতে। হেনরীর মাকেও তারা হত্যা করে, ছিনিয়ে নেয় তারা তার দেহ থেকে মনিমুক্তাখচিত অলঙ্কার।

তারপর?

তারপর মরেন এবং তার অনুচরগণ লুণ্ঠনকার্য শেষ করে যখন নিজেদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছিলো তখন একটি শিশুর করুণ কান্না তাকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। মরেন দেখতে পায় হেনরী তার মৃত মায়ের বুকে পড়ে কাঁদছে।

তারপর?

মরেন ঐ শিশু কন্যাটিকে তুলে নেয় কোলে। নিয়ে আসে নিজের গুহায়।

মরেনই তাহলে তাকে লালন পালন করেছিলো?

হাঁ। সেই সে দিনের অসহায়া ছোট্ট শিশু হেনরী আজকের দস্যুরাণী।

তাহলে দস্যুরাণী কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা?

হাঁ নূরী। একটু থামলো বনহুর, তারপর পুনরায় বলতে শুরু করলো—নূরী, এ পৃথিবীতে কত মানুষ আছে যারা অবস্থা এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ পালটে যায় বা গেছে। যেমন পালটে গেছি আমি নিজে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বনহুরের বুক চিরে। থেমে বলে—আজ আমি লজ্জা বোধ করি আমার বংশ পরিচয় দিতে। কত অধঃপতনে গেছি আমি.....

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়—ছিঃ তুমি এ কথা বলতে পারলে হুর? কে বলে তুমি অধঃপতনে গেছো? তুমি তো কোনো অন্যায় করোনা। যারা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে তুমি তাদের সেই অর্থ এবং ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে যারা অসহায়, যারা সম্বলহীন তাদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। কে বলে তুমি অধঃপতনে গেছো?

আমার মন। আমার মন বলে নূরী। আমি মানুষ নই জানোয়ার। কারণ অনেক সময় আমাকে এমন অনেক কাজ করতে হয় যা আমার কাছে অতি ঘৃণার, অতি জঘন্য। বিবেকের কাছে আমি তখন পরাজিত হই.....

মিছামিছি তুমি নিজের উপর অবিচার করছো হুর।

না, মিছামিছি নয়। নূরী, কত সময় আমাকে এমন কাজ করতে হয় যা নিজকে দংশন করে কিন্তু না করে উপায় থাকে না। নূরী, মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, সংযমচ্যুত হই...যা আমার জন্য অন্যায়, হয়তো এমন কাজও করে বসি।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায়—সর্দার।

তাজ প্রস্তুত হয়েছে?

হাঁ।

চলি এবার!

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে যায়।

নূরী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বনহুরকে সে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। ওকে যত দেখে ততই যেন অবাক হয়। বড় অদ্ভুত, বড় বিস্ময় যেন

ও। নূরী শুনতে পায় অশ্বপদশব্দ। বুঝতে পারে বনহুর তাজকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো রহমান।

নূরী তখন জাভেদের জামা সেলাই করতে বসে গেছে। জাভেদ আজকাল শহরের স্কুলে পড়াশোনা করে। তাকে সে কারণে বনহুরের শহরে আস্তানায় থাকতে হয়। জাভেদের দেখাশোনার জন্য রহমানকে তাই বেশি সময় কান্দাই জঙ্গলের আস্তানা ছেড়ে শহরেই থাকতে হয়। কোনো কোনো সময় বিশেষ কারণে রহমান এখানে আসে।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো নূরী—তোমাদের সর্দার আজকাল সব সময় বড় উদাসীন থাকে। আমার মোটেই ভাল লাগে না তার এই উদাসীন ভাব। শুনলাম সে আবার সেই দস্যুরাণীর নিকটে যাচ্ছে।

হাঁ, কিন্তু দস্যুরাণীর নিকটে নয়, একটি অসহায়া রমণীকে দস্যুরাণীর মৃত্যুদণ্ড থেকে উদ্ধার করতে।

শুনেছি কিন্তু সে কাজ তো তার অনুচরদের দ্বারাও সম্ভব হতো?

হতো কিন্তু সর্দারের কর্তব্য তাকে উদ্ধার করা।

কারণ তার জন্যই দস্যুরাণী তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে, এই তো?

হাঁ।

রহমান, সত্যিই কি তোমাদের সর্দার দস্যুরাণীর কবল থেকে সেই রমণীকে উদ্ধার করতে যাচ্ছে, না দস্যুরাণীর সাক্ষাৎলাভ তার কামনা?

নূরী, তুমি এ ধরনের কথা বলবে তা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। সর্দারকে তুমি তাহলে আজও চিনতে পারোনি।

রহমান, সর্দারকে আমি যেমন চিনেছি তেমন করে কেউ কোনোদিন তাকে চিনবে না।

তবে এমন কথা কেন বললে?

জানি না কেন যেন ও আজকাল আস্তানায় থাকতে চায় না। সব সময় আস্তানার বাইরে থাকতে ভালবাসে...

বুঝেছি, সর্দারের উপর তোমার রাগ হয়েছে।

রাগ করে লাভ কি রহমান ভাই। জানি সে কোনোদিন স্থির হবে না শান্ত হবে না...

তুমি কি চাও সর্দার স্থির-শান্ত হোক?

কোন মেয়ে না চায় তার স্বামীকে সব সময় পাশে পেতে। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করে নাসরিন।

রহমান একটু হেসে বলে—স্বামীদের মনেরও তেমনি বাসনা সব সময় উঁকি দেয়, কিন্তু...

বলো, থামলে কেন?

কিন্তু উপায় হয় না। যাক, তোমার চঞ্চলা কোথায়?

বাগানে হরিণ নিয়ে খেলা করছে।

নূরী হেসে বললো—একটি মেয়ে তার দশটি নাম। আবার চঞ্চলা হলো কবে থেকে?

রহমান বললো—দেখছোনা কেমন চঞ্চল মেয়েটা, একদণ্ড চুপ চাপ থাকতে দেখি না। কখনও বাগানে হরিণ না হয় বাঘের বাচ্চা নিয়ে খেলা করছে। কখনও তীরধনু নিয়ে, কখনও তলোয়ার নিয়ে। ঘোড়ায় চড়তেও শিখবে ক'দিন পরে...

কেন, তোমার ভয় হচ্ছে নাকি? বললো নূরী।

নাসরিন হেসে বললো—বাপ মেয়েকে ভয় পাবে না তো ভয় পাবে কাকে। নূরী, সর্দার নাকি আবার মন্থনায় যাচ্ছেন?

হাঁ। বললো নূরী।

নাসরিন বললো—দাইমা যে বললো এবার তার যাত্রা শুভ হবে না?

বলেছিলাম কিন্তু সে শুনবে না।

রহমান বললো—আজ এ কথা নতুন নয়, সর্দার কোনোদিন তার কোনো কাজে কারো মানা শুনেছে মনে পড়ে তোমাদের?

জানি শোনে না, শোনেনি কোনোদিন। কিন্তু এবার আমার মনও বলছে তার না যাওয়াই ভাল ছিলো। বললো নূরী।

নাসরিন বললো—ওগো, তুমিই না হয় সর্দারকে যেতে বারণ করো। দাইমার কথা কোনো সময় বিফলে যাবে না।

এখানে যখন বনহুরকে নিয়ে আলোচনা চলছিলো তখন বনহুর তাজের পিঠে ছুটে চলেছে কান্দাই শহরাভিমুখে।

এক সময় বনহুর পৌঁছে যায় শহরের অনতিদূরে, যেখানে জঙ্গল শেষ হয়ে এসেছে। অদূরে পথের উপর অপেক্ষা করছে বনহুরের গাঢ় নীলাভ রঙের গাড়িখানা। গাড়ির ড্রাইভ আসনে উপবিষ্ট রয়েছে বনহুরের একজন অনুচর।

বনহুর তাজ থেকে নেমে দাঁড়াতেই গাড়ির দরজা খুলে ধরলো ড্রাইভারবেশী বনহুরের অনুচরটি। বনহুর তাজের পিঠে মৃদু আঘাত করে বললো—যা, আস্তানায় ফিরে যা তাজ। পথে দেরী করবি না, চলে যা।

তাজ সম্মুখের একখানা পা দিয়ে মাটিতে মৃদু আঘাত করে শব্দ করলো।

বনহুর ততক্ষণে গাড়িতে চেপে বসেছে।

এবার গাড়িখানা উল্‌কা বেগে ছুটতে শুরু করলো।

বনহুর পিছন আসনে বসেছিলো, এবার সে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। সিগারেটের ধুম্ররাশি চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়লো গাড়িখানার মধ্যে।

মিঃ হেলালী তাঁর অফিসকক্ষে বসে সেদিনের একটা সংবাদপত্র মনোযোগ সহকারে পড়ছিলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে ভারী জুতোর শব্দে চোখ তুলে তাকান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেন মিঃ হেলালী কিন্তু চোখ দুটো তাঁর আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললেন তিনি—আপনি... আপনি এসেছেন?

আপনি নয়, বলুন তুমি।

আপনি দস্যু হলেও আমার জীবনরক্ষক, আমার শ্রদ্ধেয় জন। মিঃ হেলালী কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

বনহুর হাস্যোজ্জল মুখে দীপ্ত কণ্ঠে বললো—বসতে আসিনি মিঃ হেলালী, জানতে এসেছি দেশের সংবাদ।

সংবাদ বড় অশুভ। কথাটা বলে মিঃ হেলালী তাঁর হস্তস্থিত পত্রিকাখানা মেলে ধরলেন টেবিলের উপরে। একস্থানে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—মিস দিপালী গতকাল রাত্রিতে তার বাসভবন থেকে নিখোঁজ হয়েছে। কোনো এক চক্রান্তকারী দল তাকে উধাও করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুহূর্তে বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়ে পড়লো, ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—দিপালী তার বাসভবন থেকে নিখোঁজ হয়েছে। পত্রিকাখানা তুলে নিলো বনহুর হাতে, তারপর মেলে ধরলো চোখের সম্মুখে। ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখখানা। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—ঠিকই বলেছেন মিঃ হেলালী, কোনো চক্রান্তকারী দল তাকে তার বাসভবন থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

মিঃ হেলালী বললেন—তার কক্ষ থেকে একটি চিঠি পাওয়া গেছে।

বনহুর বললো—চিঠি!

হাঁ, চিঠিখানা আমার নিকটেই আছে, কারণ দিপালীর নিখোঁজ সংবাদ শুনে আমি মিঃ জাফরী সহ তার বাসভবনে গিয়েছিলাম। যে কক্ষ থেকে তাকে উধাও করা হয়েছে সেই কক্ষ তল্লাশি চালিয়ে এই চিঠিখানা পাওয়া গেছে। মিঃ হেলালী পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে বনহুরের হাতে দেন।

গাঢ় নীল কাগজে মাত্র কয়েক লাইন লেখাঃ

—বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম
মৃত্যু। আমাদের সঙ্গে মিস
দিপালী যে বিশ্বাসঘাতকতা
করেছে, তার জন্য তাকে আমরা
মৃত্যুদণ্ড দেবো। এ কারণেই
তাকে নিয়ে গেলাম।
—মাকড়সা

কাগজখানায় ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বনহুরের নজরে পড়লো সমস্ত চিঠিখানা জুড়ে একটি মাকড়সার প্রতিচ্ছবি আঁকা রয়েছে।

বনহুর কিছুক্ষণ কাগজখানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে রইলো, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে।

মিঃ হেলালী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো দস্যু বনহুরের মুখে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বললো—মিঃ হেলালী, কে সে মাকড়সা জাল যে মিস দিপালীকে উধাও করেছে? সে যেই হোক তার মাকড়সার জাল ছিঁড়ে খান খান করতে হবে। দাঁতে দাঁত পিষে কথা শেষ করলো বনহুর।

মিঃ হেলালী বললেন—দিপালীর সহযোগিতায় আমরা দেশের জনগণের উপকারে কিছুটা অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে একটি জঘন্য চোরাকারবারী দলকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি।

হাঁ, সেই কারণেই মাকড়সা দিপালীকে তার জালে টেনে নিয়েছে। মিঃ হেলালী, একটা বিরাট বিদেশী চক্রান্তজালে দেশটা আজ জড়িয়ে পড়েছে, যার জন্য আজ দেশের জনগণের এই অবস্থা। এই বিদেশী চক্রান্তের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে, নাহলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে না। থামলো বনহুর।

মিঃ হেলালী বললেন—আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যাতে এই বিদেশী চক্রান্তকারী দলকে আমরা শায়েস্তা করতে পারি।

বনহুর বললো—সেজন্য আপনাদের আমি জানাই সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু চক্রান্তকারী মাকড়সা কারা, তাদের যতক্ষণ না খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছেন ততক্ষণ আপনারা কি করে তাদের শায়েস্তা করবেন? আমি আজ বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারছি না। মিঃ হেলালী, আপনি মিস দিপালীর সন্ধান করুন এবং তার উদ্ধারের চেষ্টা চালান। চিঠিখানা আপাততঃ আমার কাছে রইলো, সময়মত পাবেন।

মিঃ হেলালী কিছু বলবার পূর্বেই বেরিয়ে যায় বনহুর। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন মিঃ হেলালী। বাইরে শোনা যায় মোটর ছাড়ার শব্দ।

❑

বনহুর ফিরে আসে তার শহরের আস্তানায়। জাভেদ ছুটে আসে পিতার পাশে, দু'হাতে পিতার হাত চেপে ধরে বলে—আব্বু তুমি এসেছো?

বনহুর ওকে টেনে নেয় কাছে, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—এইতো এসেছি। কেমন আছো জাভেদ?

খুব ভাল আছি আব্বু। জানো আমি ঘোড়ায় চড়তে শিখেছি। তীরধনু চালাতে শিখেছি...

আর পড়াশোনা? বলে বনহুর।

পড়াশোনা আমার মোটেই ভাল লাগে না আব্বু। পড়ে কি হবে বলো তো?

বনহুর পুত্রের প্রশ্নে চমকে উঠলো যেন, বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো সে জাভেদের মুখের দিকে, বললো—পড়াশোনা না করলে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয় না, বুঝলে? তাই পড়াশোনা করতে হয়।

আমি পারবো না পড়তে। মুখ বাঁকা করে রইলো জাভেদ।

বনহুর ডাকলো—কায়েস?

ছুটে এসে কুর্ণিশ জানালো কায়েস—সর্দ্দার।

জাভেদ পড়াশুনা কেমন করছে?

কায়েস চোখ তুলে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো জাভেদকে, তারপর বললো—ভালই পড়াশোনা করছে।

মিথ্যে কথা!

সর্দার!

চলো কোথায় জাভেদের বইখাতা আমাকে দেখাও, চলো। জাভেদ, তুমিও চলো, আমি আজ পরীক্ষা করে দেখতে চাই লেখাপড়ায় তুমি কতদূর অগ্রসর হয়েছো।

জাভেদ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কায়েসও নিশ্চল।

বনহুর রাগতঃ কণ্ঠে বলে—চলো।

এবার কায়েস এবং জাভেদ সম্মুখে পা বাড়ালো।

জাভেদের কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো বনহুর, টেবিলে কতকগুলো ছেঁড়া বইয়ের স্তূপ। টেবিলে পিস্তল, তীরধনু আর তলোয়ার পড়ে আছে। বনহুর খুব ভালভাবে এসব লক্ষ্য করলো, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—জাভেদ, তোমার টেবিলে এসব অস্ত্র কেন?

জাভেদ নির্ভীক কণ্ঠে বললো—আমি এসব অস্ত্র চালানো শিখছি।

এসব অস্ত্র চালানো শিখে তুমি কি করবে? কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর।

জাভেদ তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো—দস্যুতা করবো।

গর্জন করে উঠলো বনহুর—জাভেদ!

আব্বু, আমি জানি তুমি কে, কি করো সব আমি শুনেছি। তুমি যেমন বিশ্ববিখ্যাত দস্যু, আমিও.....

জাভেদ.....একটা শব্দ করে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দেয় বনহুর তার পুত্রের গালে। তারপর দ্রুত বেরিয়ে যায় সে কক্ষ থেকে—

সোজা বনহুর ফিরে আসে তার আস্তানায়।

রহমান তার দলবল নিয়ে অস্ত্র পরিস্কার করছিলো, এমন সময় বনহুর এসে দাঁড়ায় সেখানে।

বনহুরকে দেখে তার অনুচরগণ বিস্মিত না হলেও চমকে উঠে ভীষণভাবে। সবাই নিজ নিজ অস্ত্র ভূতলে রেখে সর্দারকে অভিবাদন জানায়। হঠাৎ সর্দার সশরীরে এখানে এসে হাজির হবে, তারা ভাবতেও পারেনি।

বনহুরের মুখোভাব দেখে সবাই ভীত হয়ে পড়েছিলো। রহমান নিজেও একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো, কারণ সর্দারের মুখোভাব স্বাভাবিক ছিলো না। তাছাড়া সর্দার কখন ফিরে এসেছে তাও তারা টের পায়নি।

বললো বনহুর—রহমান, জাভেদকে শহরের আস্তানায় কেন রাখা হয়েছে?

রহমান এবং অন্যান্য অনুচর মুহূর্তমধ্যে যেন চমকে চোখ তুললো, সর্দারের মুখে তাকালো সবাই। রহমান বললো—সর্দার, জাভেদকে শহরের আস্তানায় পড়াশোনা শেখার জন্য রাখা হয়েছে।

কিন্তু সেকি পড়াশোনা করছে সেখানে?

রহমান নীরব।

বনহুর বলে উঠে—পড়াশোনার বদলে সে অস্ত্র চালনা শিক্ষা করছে না?

রহমান বললো—প্রথমে সে ভালভাবেই পড়াশোনা করছিলো, কিন্তু.....

বলো, থামলে কেন?

ইদানীং সে পড়াশোনায় মোটেই আগ্রহী নয়।

বনহুর রহমানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো—শুধু অস্ত্র চালনায় উৎসাহী, কেমন?

হাঁ সর্দার।

কে তাকে অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছে?

রহমান নীরব।

বনহুর বললো—আমি চাই না আমার সন্তানগণ আমার পথ অনুসরণ করে। একটু থেমে বললো সে—জাভেদকে তুমিই তাহলে অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছো?

রহমান এতক্ষণ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো, এবার সে দৃঢ়কণ্ঠে বললো—যার মধ্যে যে স্পৃহা আছে তা কোনোদিন কেউ দমন করে রাখতে পারে না। সর্দার, জাভেদের মধ্যে আছে আপনার রক্ত কাজেই এমন কোনো শক্তি নেই যা তাকে দাবিয়ে রাখে বা রাখতে পারে।

কথাগুলো বলে থামলো রহমান।

বনহুর রহমানের কথায় কোনো জবাব দিতে পারলো না। গভীর একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে।

রহমান বললো আবার—সর্দার, জাভেদ যা করতে চায় তাতে তাকে বাধা দেওয়া সমীচীন হবে না। তার মধ্যে আমি দেখেছি এক অদ্ভুত দীপ্ত ভাব। অসীম এক শক্তির উৎস লুকিয়ে আছে তার মধ্যে।

বনহুর কোনো কথা না বলে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় সেই গুহা থেকে।

ফিরে আসে বনহুর নিজের বিশ্রামকক্ষে। শরীর থেকে পোশাক না খুলেই অর্ধশায়িত অবস্থায় হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে সে।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় সেখানে, বনহুরকে গম্ভীরভাবে সিগারেট পান করতে দেখে একটু হেসে বলে সে—হঠাৎ কি হলো বলো তো অমন চুপচাপ রয়েছো কেন?

বনহুর চোখ তুলে তাকালো নূরীর মুখে, তারপর বললো—আমি যা ভেবেছিলাম তাই হলো।

কি ভেবেছিলে হুর?

ভেবেছিলাম জাভেদ অমানুষ হবে, তাই হয়েছে সে।

হুর!

হাঁ নূরী।

তুমি এসব কি বলছো?

ঠিকই বলছি। আজ জাভেদের সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে আমি বড় দুঃখ পেয়েছি, কারণ জাভেদ লেখাপড়া না শিখে অস্ত্র চালনা শিখছে।

নূরী হেসে উঠলো খিলখিল করে।

বনহুর সোজা হয়ে বসে অবাক হয়ে তাকালো, বললো—হাসছো যে বড়?

মেষশাবক মেষই হয় আর সিংহশাবক সিংহই হয়। জাভেদ বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুরের সন্তান, সে কোনোদিন.....

নূরী!

হাঁ, আমি জানি জাভেদ তোমার চেয়ে বড় না হতে পারলেও তোমার চেয়ে কম হবে না।

নূরী, তুমি কি চাও সে অমানুষ হোক?

হুর, তুমি কি নিজে অমানুষ?

হাঁ আমি অমানুষ। কারণ মানুষ যা না করে আমি তাই করি। যদিও আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সবাই জানে আমি মহৎ আমি মহান কিন্তু আমি নিজে জানি আমি যা করি তা অন্যায়।

হুর, তুমি এসব কি বলছো?

সত্যি নূরী, আইনের চোখে আমি অপরাধী, আমি দোষী। কারণ কোন ধর্মেই নাই একজনের সম্পদ ছিনিয়ে আর একজনকে দেওয়া।

তুমি তো কোনো সৎ মহৎ ব্যক্তির সম্পদ লুটে নাও না, তুমি যা কর লোকের মঙ্গলের জন্য করো।

তবু আমি অপরাধী। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—মাঝে মাঝে মনে হয় আত্মহত্যা করি কিন্তু.....

হুর!

হাঁ নূরী, মন বিষিয়ে উঠে যখন এই পৃথিবীর আসল রূপ আমার চোখে ধরা পড়ে। কি করে মানুষ...মানুষ হয়ে একজনের মুখের গ্রাস আর একজন কেড়ে খায়। কুকুরের চেয়েও আজ দেশের মানুষ হীন, জঘন্য। নিজের স্বার্থের জন্য উন্মাদ। কি করে জনগণের আহার গুদামজাত করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করবে, কি করে গাড়িবাড়ি ঐশ্বর্য বাড়াবে, আজকের দুনিয়ায় যেন তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এক শ্রেণীর ধনকুবের ধনের কুমির বনে আরও পাওয়ার আশায় কুৎসিত ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। আর এক শ্রেণীর মানুষ আজ উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ, ক্ষুধা-পিপাসায় পথে পথে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। নূরী এসব দেখেও কি স্থির থাকতে পারা যায়? পারি না, তাই এত জেনেও মানুষ হয়ে অমানুষের কাজ করি! আইন ছিন্ন করে অন্যায়কে আঁকড়ে

ধরি...কিন্তু পরপরই বিবেকের কাছে দংশিত হই। তখন মনে হয় নিজকে হত্যা করে মুক্তি লাভ করি।

হুর, আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো ? নূরী বনহুরের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

বনহুর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলে—ভেবেছিলাম জাভেদ লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। যেমন নূর আজ লেখাপড়া শিখে তার মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে তুলেছে। জানো, নূর তাদের স্কুলের মধ্যে শিক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে।

এ যে আমারও পরম আনন্দ। আমি জানতাম, নূর একদিন এমনিই হবে। সেও যে তোমারই সন্তান। তার ধমনিতেও যে প্রবাহিত হচ্ছে তোমারই রক্ত। নূর বড় হবে শিক্ষা-দীক্ষা আদর্শে আর জাভেদ হবে তোমারই মত সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু সর্দার.....

নূরী!

হাঁ, কোনো শক্তিই তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে করবে সে সংগ্রাম, যেমন করে চলেছো তুমি।

নূরী, তুমি কি তাহলে খুশি হও?

হাঁ, আমি খুশি হই।

বেশ, তাহলে জাভেদ তোমার মনের মত হয়েই গড়ে উঠুক।

তুমি দোয়া করো তাই যেন হয়। কথাটা বলে নূরী স্বামীর বুকে মাথা রাখে। একটু পরে বলে সে—তুমি মন্থনায় যাচ্ছো?

হাঁ, যেতে হবে।

না গেলেই কি নয়?

নূরী, একটা অসহায় তরুণী বিনাদোষে প্রাণ হারাবে, এ আমি চাই না। সিমকী নামক এক তরুণী...

আমি রহমানের মুখে সব শুনেছি।

তাহলে বলো তার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমি নই কি? কাজেই আমাকে যেতেই হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দস্যুরাণী হেনরীর সাঙ্গে আমাকে মোকাবেলা করতে হবে।

বেশ যাবে যাও কিন্তু তুমি কতদিন মনিরা আপার সঙ্গে দেখা করোনি স্মরণ আছে?

আছে, মাত্র কয়েক মাস।

কিন্তু সেখানে আছেন তোমার মা, তাঁর সঙ্গেও তুমি কতদিন সাক্ষাৎ করোনি।

হাঁ, অনেকদিন মাকে দেখেনি নূরী। সত্যি, মা হয়তো আমার জন্য বড় চিন্তিত আছেন।

তবে তুমি বিলম্ব করোনা, মায়ের সঙ্গে দেখা করে তারপর পুনরায় মন্থনায় যাবে।

নূরী, ঠিক বলেছো, মাকে না দেখে, মার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যাবো না কোথাও।

তবে আজই রাতে তুমি কান্দাই যাও।

হাঁ, তাই যাবো কিন্তু...

জানি সেখানে তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্য অহরহ পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

তবু আমাকে যেতে হবে।

সাবধানে যেও কিন্তু।

নূরী, সত্যি তুমি সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অনেক বড়। পৃথিবীতে এমন অনেক কম মেয়েই আছে যে তার স্বামীকে হাসিমুখে...

বিপদের মুখে সঁপে দিতে পারে, এই তো?

মেয়েরা স্বামীকে মৃত্যু গহ্বরেও ঠেলে দিতে পারে তবু পারে না দ্বিতীয় নারীর হাতে স্বামীকে সমর্পণ করতে। নূরী, তুমি সেদিক দিয়ে অদ্বিতীয়া।

দোয়া করো যেন যেন তোমার সুখের জন্য, তোমার আনন্দের জন্য হাসিমুখে প্রাণও বিলিয়ে দিতে পারি।

নূরী...বনহুর ওকে টেনে নেয় গভীর আবেগে।

❑

মনিরা আয়নার সম্মুখে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলো। টেবিলে নানা রকম প্রসাধনী দ্রব্য থরে থরে সাজানো রয়েছে। মনিরা এসব ভুলেও কোনোদিন ব্যবহার করে না। হঠাৎ কোনোদিন যদি কোথাও বেড়াতে যায় তখন একটু আধটু গ্রহণ করে মনিরা, যতটুকু না হলে নয়।

আজ মনিরা কোনো এক বান্ধবীর বাড়ি বেড়াতে যাবে, তাই সে নিজকে সুন্দর করে সাজালো। কোন্ রঙের টিপ পরবে ভাবছে মনিরা, যদিও তার শাড়ি এবং ব্লাউজখানা ছিলো ফিকে গোলাপী রঙের।

মনিরা গোলাপী রঙের টিপদানটা হাতে তুলে নিতেই কে যেন বললো...উঁহুঁ ওটা নয়, গাঢ় নীল। চমকে পিছু তাকালো—না, কেউ তো নেই ঘরে। চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে গাঢ় নীল রঙের টিপ দানীটা সে তুলে নিলো হাতে।

টিপ পরে তাকালো সে আয়নায়, অপূর্ব লাগছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ যেন বেশি সুন্দর লাগছে তাকে। কয়েক গোছা চুল ছড়িয়ে পড়ে আছে ললাটের চারপাশে। এ চুলগুলো যেন বড় অবাধ্য, চিরুনী দিয়ে বার বার সংযত করার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই সেগুলো সংযত হয়নি। কোঁকড়ানো এই চুলগুলো ছড়িয়ে থাকে সব সময় ললাটের উপরে। মনিরা শেষবারের মত চিরুণী দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

এমন সময় ড্রাইভার কক্ষে প্রবেশ করে সালাম জানালো।

অবাক হলো সে। একটু রাগতঃ কণ্ঠেই বললো মনিরা ড্রাইভারকে তার ঘরে প্রবেশ করার সাহস দেখে তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো, আমি আসছি।

ড্রাইভার বেরিয়ে গেলো।

মনিরা আয়নায় আর একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিয়ে ব্যাগ তুলে নিলো হাতে, তারপর শাশুড়ির ঘরে প্রবেশ করে বললো— মামীমা!

যাও মা তাড়াতাড়ি যাও, শিগ্‌গির ফিরে এসো।

মনিরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

মনিরা গাড়ির নিকটে পৌঁছতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

মনিরা গাড়িতে উঠে বসলো।

ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললো। কোথায় যেতে হবে পূর্বেই ড্রাইভারকে বলা ছিলো, কাজেই মনিরা গাড়িতে বসে কোনো কথা বললো না।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

মনিরা নিশ্চুপ বসে আছে, দৃষ্টি তার বাইরের দিকে। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাজপথে আলোগুলো এখনও জ্বলে উঠেনি। নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে লাইটপোষ্টগুলো।

পথের দু'ধারে দোকান এবং গাড়িগুলোকে এক একটা দৈত্যের মত মনে হচ্ছে। বেলাশেষের নিস্প্রভ সূর্য ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে যাচ্ছে ঐসব দৈত্য সমতুল্য বাড়িগুলোর পিছনে।

মনিরা আনমনে কি যেন ভাবছিলো সে-ই জানে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এলো তার, কখন যে তার গাড়িখানা নির্জন পথে এসে পড়েছে খেয়াল করেনি মনিরা। চমকে সোজা হয়ে বসে বললো—ড্রাইভার, এ তুমি কোন্ পথে নিয়ে এলে?

পুরোন ড্রাইভার, কাজেই সে সব পথ চেনে তাই মনিরা তাকে কোনো পথের নির্দেশ দেয়নি। তাকিয়ে দেখলো এটা সম্পূর্ণ অজানা পথ। পথের দু'পাশে আলোকগুলো ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে। মনিরা কথায় বললো ড্রাইভার—নতুন পথে।

মনিরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—এসব তুমি কি বলছো?

হাঁ আপামনি, এ নতুন পথ।

ততক্ষণে একটি পোড়াবাড়ির সম্মুখে এসে গাড়িখানা থেমে গেছে।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরলো—নেমে আসুন।

না, আমি নামবো না। আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে এলে?

সত্যি নামবে না?

একি তুমি!

হাঁ, তাছাড়া কোনো উপায় ছিলো না।

মনিরার মুখমণ্ডলে একরাশ খুশীর উচ্ছলতা ছড়িয়ে পড়ে। চোখ দুটো আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠে ওর। নেমে দাঁড়ায় গাড়ি থেকে।

ড্রাইভার এগিয়ে যায় পোড়োবাড়িখানার দিকে।

মনিরা ওকে অনুসরণ করে।

একটি অর্ধভগ্ন দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ড্রাইভার পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ফেলে। মনিরাকে লক্ষ্য করে বলে—এসো!

মনিরা নির্বাক পুতুলের মত পা পাড়ায়।

ড্রাইভার দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতেই একটি প্রশস্ত উঠান—উঠান পেরিয়ে মস্তবড় টানা বারান্দা। বারান্দার পরই বেশ বড় বড় কয়েকখানা ঘর।

মনিরা তাকিয়ে দেখে উঠানে আগাছা আর জঙ্গলে ভরা। কতদিন যে এ বাড়িতে লোক নেই কে জানে। জঙ্গলে আর আগাছায় উঠানে পা রাখার জায়গা নেই যেন।

ড্রাইভার তারই মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে এগুলো। মনিরা ওকে অনুসরণ করে চলেছে।

বারান্দায় পা রাখতেই কতকগুলো বাদুড় পাখা ঝাপটে উড়ে উঠলো।

মনিরা চমকে ড্রাইভারকে আঁকড়ে ধরলো।

ড্রাইভার ওকে নিবিড় করে টেনে নিলো কাছে।

মনিরা বুঝতে পারে বহুদিন এ বাড়িতে মানুষের পদক্ষেপ না পড়ায় বাদুড়ের দল আস্তানা গেছে বসেছে। ড্রাইভারের কাছ থেকে নিজকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো মনিরা।

কিন্তু ড্রাইভার মনিরাকে মুক্তি দিলো না।

বললো মনিরা—এমন করে এখানে নিয়ে আসার কি দরকার ছিলো বলো তো?

জানো তো চৌধুরী বাড়ির চারপাশে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি সদা বিচরণ করে ফিরছে। কতদিন তোমাকে একান্ত নিবিড় করে পাইনি, তাই...

তাই তুমি নিয়ে এলে এই পোড়াবাড়ির অভ্যন্তরে একান্ত নিবিড় করে পাবার জন্য?

হাঁ মনিরা।

বনহুর এগিয়ে গিয়ে একটি কক্ষের দরজায় মৃদু চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় দরজাখানা। মনিরা বিস্ময় নিয়ে দেখে একটি সুড়ঙ্গপথ সেই কক্ষের মেঝেতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বনহুর মনিরার ডান হাতখানা চেপে ধরে বলে—এসো।

মনিরা বললো—ভয় করছে।

বনহুর হেসে বললো—দস্যুসঙ্গিনীর ভয়! এসো বলছি।

চলো, কিন্তু...

কোনো কিন্তু নয়, আজ সমস্ত রাত তোমাকে এখানে কাটাতে হবে।

মনিরার হাত ধরে বনহুর সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে চলে। সুড়ঙ্গপথ আধো অন্ধকার হলেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো সব। মনিরা যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই

বিস্মিত হতবাক হচ্ছে। একটা নীলাভ আলোচ্ছটা সুড়ঙ্গপথটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

স্বামীর হাতের মুঠায় মনিরার হাতখানা এখনও ধরা আছে। হৃদয়ে ওর অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস, এমনি করে স্বামীর হাতে হাত রেখে সে যদি যুগ যুগ চলতে পারতো তাহলে সে জীবনে সব চাইতে বেশি খুশি হতো।

সুড়ঙ্গপথ আঁকাবাঁকা হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে।

বনহুর বললো—মনিরা, এটা আমার একান্ত নির্জন গোপন গুহা। সম্মুখ অংশ পোড়োবাড়ি হলেও এর নিচে আছে একটি বিরাট গহ্বর। এখানে শুধু আমি ছাড়া আর কেউ নেই বা থাকে না। মনিরা, এখানে শুধু তুমি আর আমি.....

তোমার মুখের আবরণ আমার কেমন যেন ভয় করছে।

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

না।

চলো গন্তব্য স্থানে পৌঁছে তুমি দেখবে তোমার স্বামীকে। এসো...

মনিরা আর বনহুর সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে চলে।

প্রায় দশ মিনিট চলার পর একটি বিরাট গুহার মধ্যে এসে দাঁড়ালো ওরা দু'জনা। প্রশস্ত প্রকাণ্ড সে গুহা। কেমন যেন থম থম করছে গুহাটা। চারদিকের দেয়ালে বড় বড় জীবজন্তুর মূর্তি মূর্তিগুলো যেন গ্রাস করতে আসছে।

মনিরা স্বামীর হাতখানা শক্ত করে এঁটে ধরলো।

বনহুর বললো—ভয় নেই মনিরা, যতক্ষণ আমি তোমার পাশে আছি।

এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?

তোমার স্বামীর নিভৃত কক্ষে।

এই বুঝি তোমার নিভৃত কক্ষ?

বনহুর এগিয়ে গিয়ে গুহার দেয়ালে একস্থানে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের কিছু অংশ সরে গেলো। মনিরা অবাক হয়ে দেখলো একটি সুন্দর দরজা।

বনহুর মনিরার হাত ধরে বললো—এসো।

বড় মনোরম সুন্দর সজ্জিত একটি কক্ষ।

মনিরা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগলো। সুন্দর মূল্যবান আসবাবে কক্ষটি সাজানো রয়েছে। সুন্দর খাটের উপরে দুগ্ধফেনিল বিছানা পাতা। একপাশে একটি মার্বেল পাথরের তৈরি টেবিল। টেবিলে একটি সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

মনিরা অবাক হয়ে দেখছে।

বনহুর এগিয়ে গেলো ওপাশের কতকগুলো লৌহসিন্দুক থরে থরে সাজানো রয়েছে। বনহুর একটির পর একটির ডালা তুলে ধরলো।

মনিরার চোখ দুটো যেন ছানাবড়া হয়ে উঠলো। লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় সিন্দুকগুলো পরিপূর্ণ! একটি দুটি তিনটি চতুর্থ এবং পঞ্চম সিন্দুকের ডালা খুলতেই কক্ষটা ঝলমল করে উঠলো। হীরা-পান্না-মনিমুক্তাখচিত স্বর্ণ অলঙ্কারে ঠাসা রয়েছে সিন্দুকগুলো।

মনিরা অবাক কণ্ঠে বললো—এসব তোমার?

না।

তাবে কার?

যদি বলি তোমার!

না, আমি ওসব গ্রহণ করতে পারবো না। ওসব আমি চাই না।

মনিরা!

হাঁ, আমার লোভ নেই, আমি শুধু চাই তোমাকে।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে—সত্যি তুমি অপূর্ব মনিরা। আমি জানতাম, নারীজাতি ঐশ্বর্যের কাঙ্গাল কিন্তু তুমি... থামলো বনহুর।

মনিরা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে।

বনহুর বলে—মনিরা, আমি জানতাম লোভ-মোহ তোমাকে কোনোদিন দুর্বল করবে না। আমি সত্যি গর্ব অনুভব করছি। মনিরা, এসব ধনসম্পদ যা দেখছো তা আমারও নয়। আমি শুধু রক্ষক মাত্র। জানো মনিরা, এগুলো আমি কোথায় পেয়েছি আর কাদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছি?

না, আমি জানি না; আর জানবোই বা কি করে। বললো মনিরা।

বনহুর মনিরা সহ খাটে বসে পড়লো। ওর চুলগুলো কপাল থেকে আংগুল দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললো—এক সাঁপুড়ে সর্দারের সহযোগিতায় আমি এই ধনসম্পদ লাভ করেছি। গভীর পাতালপুরী থেকে এগুলো আমি উদ্ধার করেছিলাম নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে। মনিরা, এই ধনসম্পদ উদ্ধার করতে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। সে এক বিচিত্র কাহিনী...

তুমি বলবে আমাকে?

কিন্তু আজ নয়। মনিরা, কতদিন পর তোমাকে এমন নিভৃতে পেয়েছি.....এখানে কেউ আমাদের সন্ধান পাবে না। এমন কি আমার অনুচরগণও কেউ এখানে এই আস্তানার খোঁজ জানে না একমাত্র রহমান ছাড়া।

তুমি এসব ধনসম্পদ এখানে রেখেছো কেন?

যখন প্রয়োজন মনে করি তখন এসব নিয়ে গিয়ে বিলিয়ে দেই দুঃস্থ জনগণের মধ্যে।

এতেই তুমি তৃপ্তি পাও?

হাঁ মনিরা। এসব তো তাদেরই জন্য আমি মজুত করে রেখেছি। যক্ষের মত আগলে থাকি যেন এগুলো কোনো সময় অন্যায়ভাবে খরচ না হয়!

ওগো তুমি কত বড়, কত মহান.....মনিরা স্বামীর বুকে নিজকে বিলিয়ে দেয়।

নির্জন ভূগর্ভে শুধু ওরা দুজন, পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি থেকে, শহরের কোলাহল থেকে দূরে অনেক দূরে!

❑

গভীর রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে শোনা যায় অশ্বপদশব্দ। পাহাড়িয়া পথের কঠিন মাটির উপরে প্রতিধ্বনি জেগে উঠে খট খট খট.....

আস্তানার সবাই সজাগ হয়ে উঠে। তারা বুঝতে পারে সর্দার ফিরে আসছে।

নূরী উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছে।

রহমান কয়েকজন অনুচর সহ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমান্বয়ে তাজের পদশব্দ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠে।

অল্পক্ষণেই পৌঁছে যায় বনহুর তার আস্তানায়।

বনহুর নেমে দাঁড়াতেই দু'জন অনুচর তাজকে ধরে ফেলে, নিয়ে যায় অশ্বশালার দিকে। বনহুর আর রহমান এগিয়ে চলে আস্তানার অভ্যন্তরে।

চলতে চলতে বলে বনহুর—আগামীকাল মন্থনার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো ভেবেছিলাম কিন্তু হলো না।

সর্দারের মুখের দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে ধরলো রহমান।

বনহুর বললো—আজ এক নতুন সংবাদ জানতে পারলাম—মিস দিপালীকে কে বা কারা উধাও করেছে।

রহমান বিস্মিত কণ্ঠে বললো—মিস দিপালী উধাও, বলেন কি সর্দার!

হাঁ, কোনো এক চক্রান্তকারীদল তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। দিপালী মিঃ হেলালীকে সহায়তা করেছিলো তাঁর কাজে, এই হলো তার অপরাধ।

সর্দার, আমি সব জানি। শহরের বাইরে কোথাও চক্রান্তকারীদল আত্মগোপন করে আছে এবং সেখানে থেকে তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর রহমানের কথায় বললো—শহরের বাইরেই শুধু তারা আস্তানা গাড়েনি রহমান, সেই শয়তান চক্রান্তকারীদল শহরের অভ্যন্তরে জনগণের মধ্যে মিশে আছে এবং মহৎ ব্যক্তির মুখোশ পরে কার্যসিদ্ধ করে যাচ্ছে। এদের চিনতে কষ্ট হলেও খুঁজে বার করতেই হবে। দিপালীকে উদ্ধার না করে মন্থনায় যাওয়া সম্ভব হবে না।

রহমান নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো, বললো এবার—দিপালীর সন্ধানে আমাদের কিছু অনুচর পাঠাবো কি সর্দার?

হাঁ, এই মুহূর্তে কান্দাই শহরের সর্বত্র আমাদের অনুচর পাঠিয়ে দাও, কারণ আমার হাতে সময় অত্যন্ত অল্প। ঠিক সময় মন্থনায় পৌঁছতে না পারলে দস্যুরাণী সিমকীর প্রাণনাশে কিছুতেই ক্ষান্ত হবে না। আমি চাই দিপালীকে উদ্ধার করে দস্যুরাণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবো। হাঁ, আরও কাজ রয়েছে আমাদের হাতে। দেশকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে, তবেই দেশে ফিরে আসবে শান্তি, স্বস্তি আর বেঁচে থাকার প্রেরণা।

বনহুর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে নূরী এসে দাঁড়ায় সম্মুখে, বলে—হুর, তুমি ফিরে এসেছো। এসো কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বনহুর বললো—চলো, কিন্তু বেশিক্ষণ তোমার কথা শোনার সময় করে উঠতে পারবো না নূরী।

জানি, আমার কথা শোনার সময় তোমার কোনোদিনই হবে না। অভিমানভরা কণ্ঠে কথাটা বলে নূরী এগুলো।

বনহুর এবার নূরীকে অনুসরণ করলো।

❑

দস্যুরাণী তার সুউচ্চ আসনে উপবিষ্টা থেকে বজ্রকঠিন কণ্ঠে তার অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো—দস্যু বনহুরকে তোমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছো?

দস্যুরাণীর অনুচরগণ মাথা নিচু করে রইলো। কেউ কোনো জবাব দিলো না।

দস্যুরাণী এবার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, মাটিতে পদাঘাত করে বললো—আমি আরও কয়েকদিন সময় দিলাম, তোমরা দস্যু বনহুরকে বন্দী করে নিয়ে আসবে নচেৎ তোমাদের কারো রক্ষা নেই। জানি বনহুর এখন মন্থনায় নেই, সে ফিরে গেছে তার কান্দাই জন্মভূমিতে, রহমত!

বলুন রাণীজী?

তুমি মন্থনায় চলে যাও এবং সঙ্গে নিয়ে যাও কিছু অনুচর। যেমন করে হোক তাকে বন্দী করে আনতেই হবে, নাহলে আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হবো না। আমি তাকে হীরা বাঈয়ের সম্মুখে হাজির করবো কেন সে তাকে এমনভাবে ধোঁকা দিয়েছে।

রাণীজী, চন্দনার জন্য কি.....

হাঁ, ওর জন্য মৃত্যুদণ্ডই বাঞ্ছনীয় কিন্তু আরও দু'দিন পিছিয়ে দাও ওর মৃত্যুদণ্ডের তারিখটা। যাও এই মুহূর্তে তোমরা চলে যাও।

রহমত মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে যায়। তাকে অনুসরণ করে তার সঙ্গীরা।

দস্যুরাণীর অনুচরবর্গ বেরিয়ে যেতেই দস্যুরাণী আসন গ্রহণ করতে যায়, ঠিক ঐ মুহূর্তে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এক জমকালো মূর্তি।

দস্যুরাণী চমকে না উঠলেও বিস্মিত হয়, কারণ তার ভূগর্ভ দরবার কক্ষে কে এই ব্যক্তি? দস্যুরাণী পা থেকে মাথা অবধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নেয় তারপর কঠিন কণ্ঠে বলে—কে তুমি?

জমকালো মূর্তি নিশ্চুপ, বরং আরও সরে আসে সে কয়েক পা।

দস্যুরাণী নির্ভীক কণ্ঠে বলে—কে তুমি জবাব দাও? আর এখানে এই দুর্গম ভূগর্ভ গুহাকক্ষে কিভাবে প্রবেশ করলে বলো?

জমকালো মূর্তি মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেলতেই মশালের আলো এসে পড়লো তার মুখে। এতক্ষণ জমকালো মূর্তির মুখের নিচের অংশ তার পাগড়ির আঁচল দিয়ে আবৃত থাকায় তার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না।

এবার সম্মুখে সাপ দেখার মতই চমকে উঠে দস্যুরাণী, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে—প্রদীপ কুমার!

না।

তবে কে তুমি?

যাকে বন্দী করার জন্য তুমি এই মুহূর্তে তোমার অনুচরগণকে কান্দাই পাঠালে।

দস্যু বনহুর!

হাঁ।

তুমি এখানে?

হাঁ দেখতেই পাচ্ছো।

দস্যুরাণী কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে, তারপর বললো—আশ্চর্য, প্রদীপ কুমার এবং তোমার মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে।

সে কারণেই তোমার অনুচরদের নিকটে নিজের অক্ষমতা গোপন করতে সক্ষম হয়েছিলো।

চুপ করো শয়তান!

শয়তান আমি নই রাণীজী, আমি কোনো শয়তানি করি না বা করিনি। একটু পূর্বে তুমি তোমার প্রধান অনুচরের নিকটে বলেছিলে তোমার বান্ধবী হীরা বাঈকে আমি ধোঁকা দিয়েছি, কাজেই তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করে তোমার বান্ধবীর সম্মুখে হাজির করবে?

হাঁ, আমি তোমাকে বন্দী করে...

কিন্তু তার পূর্বে শুনে রাখো রাণীজী, তোমার বান্ধবী হীরার আমি কোনো ক্ষতি করিনি।

ক্ষতি করোনি? তার সঙ্গে তুমি প্রেমের অভিনয় করোনি? কি অধিকার ছিলো তোমার তার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করার?

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠে ভীষণভাবে।

দস্যুরাণীর দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে, দস্যু বনহুরকে সে এমনভাবে দেখেনি। তাকে সে এমনভাবে একেবারে নিজের দরবারকক্ষে দেখবে, আশাও করেনি কোনো সময়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দস্যুরাণী বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুরের হাসির শব্দ যেন চারপাশের দেয়ালে আছাড় খেয়ে খেয়ে ফিরে আসে দস্যুরাণীর কানে। অদ্ভুত সে হাসির শব্দ।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—কেউ যদি কাউকে জোরপূর্বক ভালবাসে তাকে বিমুখ করাটাও কারো পক্ষে সমীচীন নয়, তাই...

তাই তুমি হীরার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করেছিলে?

হাঁ, মিথ্যা নয় আমি তার সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম।

এ রকম অভিনয় তুমি কত জনার সঙ্গে করেছো দস্যু বনহুর?

বাহাদুর! চমৎকার একটি উপাধি লাভে সক্ষম হলাম রাণীজী।

জবাব দাও আমি তোমাকে যে প্রশ্ন করেছি তার।

ঠিক আংগুলে গুণে বলা সম্ভব নয় রাণীজী, তবে অনুমান কয়েক শত হবে।

শুধু শত নয়, কয়েক হাজার বলা চলে।

তাও মিথ্যা নয়, কারণ প্রথমেই বলেছি আংগুলে গুণে বলা সম্ভব নয়।

জানো এটা তোমার কত বড় দোষ?

দোষ নয়—অপরাধ।

তবু তুমি...

নিরুপায় হয়ে।

কিন্তু কি অধিকার আছে তোমার এ মিথ্যা অভিনয় করার?

জানো, হীরাবাঈ আজও তোমার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধরে তোমাকে স্মরণ করে চলেছে।

এ আমার অপরাধ নয় রাণীজী, অপরাধ তোমার বান্ধবীর। কারণ সে তাদের ধর্ম বিরোধী কাজ করেছিলো। তাদের ধর্মে রয়েছে বিধবা নারীর পুরুষের মুখোদর্শন নিষিদ্ধ।

দস্যুরাণী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—হীরা বিধবা? কে—কে বললো তোমাকে এ কথা?

হাঁ, হীরা বিধবা এবং সে বাল্যবিধবা।

মিথ্যা কথা!

না, মিথ্যা নয়—অতি শিশুকালে সে তার স্বামীকে হারিয়েছিলো এবং সেই কারণেই তাকে সিন্ধিরাজ তার রাজঅন্তঃপুরের অভ্যন্তরে রাখতো যেন কোনোক্রমে কোনো পুরুষের সান্নিধ্যলাভে সে সক্ষম না হয়। এজন্য ছিলো তার উপর কড়া পাহারার ব্যবস্থা।

এত সব জানো তুমি?

আরও জানি, দিনের আলোতে তাকে কোনোদিন রাজঅন্তঃপুরের বাইরে আসতে দেওয়া হতো না। ভোররাতে যখন সমগ্র পৃথিবী ঘুমে অচেতন থাকতো তখন হীরা তার বান্ধবীদের নিয়ে সমুদ্রতীরে যেতো স্নান করতে। কিন্তু মহারাজের চোখে ধুলো দিয়ে রাজকন্যা হীরা তার ধর্ম বিরোধী কাজে মত্ত হয়েছিলো। সে আমাকে নিয়ে প্রেমাভিনয়ে মেতে উঠেছিলো চরমভাবে

না, তার সে প্রেম অভিনয় নয়, সত্যি সে তোমাকে ভালবেসেছিলো মনপ্রাণ দিয়ে।

কিন্তু সে যা করছিলো তা তার জন্য চরম অপরাধ ছিলো।

তুমি তার জন্য দায়ী, কেন তুমি তাকে বুঝতে দাওনি তোমার সান্নিধ্য মিথ্যা, তুমি তাকে ভালবাসোনি।

বলেছি, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে নেয়নি। রাণীজী, তুমি জানো না, আমি হীরাবাঈয়ের পিতাকে বাধ্য করেছিলাম তার কন্যাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে দিতে।

মিথ্যা কথা!

না সত্য।

হীরাবাঈকে তুমি দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়েছিলে?

আকাশে সূর্য যেমন সত্য তেমনি সত্য হীরাবাঈয়ের দ্বিতীয় বিয়ে।

কিন্তু সে তার স্বামীকে মেনে নেয়নি। হীরা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো তোমাকে। তাই আমি চাই তুমি হীরাকে গ্রহণ করবে, নাহলে....

বলো, থামলে কেন রাণীজী?

তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দেবো।

হাঃ হাঃ হাঃ, মৃত্যুদণ্ড দেবে আমাকে?

হাঁ।

চমৎকার। তোমার বান্ধবীকে গ্রহণ না করলে তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। আর যদি তাকে গ্রহণ করি?

পুরস্কার পাবে।

পুরস্কার? কি পুরস্কার দেবে রাণীজী?

যা চাইবে।

সত্যি বলছো তো?

দস্যুরাণী কোনো দিন মিথ্যা বলে না।

তোমার সহচরী চন্দনার মুক্তি চাই।

মুহূর্তে দস্যুরাণীর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললো— অসম্ভব!

কেন?

সে জবাব তোমাকে দিতে আমি রাজি নই।

তবে তুমি যা বলছো আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

তোমাকে আমি বন্দী করবো।

কি বললে রাণীজী আমাকে তুমি বন্দী করবে?

হাঁ, তোমাকে আমি বন্দী করে ফেলেছি দস্যু বনহুর। কারণ, তুমি ইচ্ছা করলেও আর এই স্থান ত্যাগ করতে সক্ষম হবে না।

বনহুর হেসে বললো—তোমার সাধ্য কি আমাকে বন্দী করো...

বনহুরের কথা শেষ হয় না, তার চার পাশে মুহূর্তে লৌহশিকের দেয়াল উঠে আসে। এত দ্রুত এই দেয়াল সৃষ্টি হয় যেন একেবারে ভৌতিক কান্ড।

বনহুর ভাবতেও পারেনি এমন একটা বেষ্টনী এখানে অদৃশ্যভাবে ছিলো।

এবার দস্যুরাণী হেসে উঠে খিলখিল করে, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলে—এবার কি করে পালাবে দস্যু বাহাদুর? শুনেছিলাম তোমাকে বন্দী করে এমন লোক এ বিশ্বে নেই, তাই আমি নিজে শপথ নিয়েছিলাম তোমাকে বন্দী না করা পর্যন্ত চন্দনাকে মুক্তি দেবো না।

বনহুর এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিলো দস্যুরাণীর কথাগুলো! সে তাকিয়ে দেখলো তার দেহের চারপাশে মজবুত লৌহশলাকা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কোনো সাধ্য নেই সেই বেষ্টনী ভেদ করে বের হওয়ার।

বনহুর যখন নিজের চারপাশের লৌহশলাকা বেষ্টনী দেয়াল লক্ষ্য করছিলো তখন দস্যুরাণী করতালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একজন অনুচর প্রবেশ করে সেখানে।

অনুচরটি বন্দী দস্যু বনহুরকে লক্ষ্য করে বিস্মিত হয় এবং মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে।

দস্যুরাণী বলে—যাও রহমতকে ডেকে আনো। তার সঙ্গে চন্দনাকে নিয়ে এসো এখানে।

অনুচরটি অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর বলে উঠে—রাণীজী, তোমার তারিফ না করে পারছি না।

কারণ?

তোমার সুনিপুণতা ও বুদ্ধিবল আমাকে অভিভূত করেছে। তোমার কাছে আমি পরাজিত হলাম। কিন্তু মনে রেখো রাণীজী, তোমার বান্ধবী হীরার কাছে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

মনে রেখো দস্যুরাণীর অসাধ্য কিছু নেই। হীরাকে তুমি গ্রহণ না করলে তোমার মুক্তি নেই।

কিন্তু তার স্বামী আছে।

আমি জানি তার স্বামীকে সে কোনোদিনই স্বীকার করে নেয়নি।

তোমার বান্ধবীকে আমি ঘৃণা করি যদি সে সত্যই তার স্বামীকে স্বীকার না করে থাকে। কারণ স্ত্রী জাতির ধর্ম স্বামী.....

সে তোমাকে স্বামীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

না, তা হতে পারে না, কারণ সে কোনোদিন আমার তরফ থেকে সে এ ধরণের কোনো ইঙ্গিত পায়নি।

আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি আমার বন্দী! বনহুর, এখন আমার জীবনের সার্থকতা এসেছে, এসেছে আমার আত্মতৃপ্তি। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে আমি আমার নিজের কাছে নিজে পরাজিত হয়েছিলাম একদিন, কারণ আমি ভুলবশতঃ বন্দী করে এনেছিলাম রাজকুমার প্রদীপকে। জেনেশুনে আমি একটি নিষ্পাপ তরুণকে আমার অন্ধ কারাকক্ষে বন্দী করে রেখেছিলাম। শুধু আমার অক্ষমতা যেন অনুচরদের কাছে প্রকাশ না পায়, এজন্যই আমি বাধ্য হয়েছিলাম এ কাজ করতে।

ও, তুমি তাহলে জানতে তোমার বন্দী আসলে রাজপুত্র প্রদীপ কুমার?

জানতাম, আর সেজন্যই আমি প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দস্যু বনহুরকে আমি বন্দী করবোই।

আজ তাহলে তোমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে রাণীজী?

হাঁ।

আমাকে বন্দী করে তুমি কি করতে চাও?

তোমার দস্যুতার বাহাদুরি ঘুচিয়ে দিতে চাই।

শুধু কি এই তোমার মূল উদ্দেশ্য?

না, তোমাকে আমার বান্ধবী হীরাবাঈকে উপহার স্বরূপ পাঠাবো।

চমৎকার!

কেন, হীরার মত মেয়ে কার না কাম্য। জানো সে শুধু রাজ-কুমারীই নয়, সে একজন অনন্যাসুন্দরী তরুণী। এমন নারীরত্ন লাভে কার না লোভ হয়?

লৌহ আবেষ্টনী মধ্যে বন্দী হয়েও বনহুর পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক রয়েছে। কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো না বা হচ্ছে না তার মুখমণ্ডলে। দস্যুরাণীর কথায় বলে বনহুর—বেশ, আমি রাজি। তোমার বান্ধবী হীরাবাঈয়ের সন্তুষ্টির কারণে তুমি আমাকে ব্যবহার করতে চাও, এ আমার পরম সৌভাগ্য বলেই আমি মনে করছি।

বনহুর, ভেবোনা তুমি হীরাকে ফাঁকি দেবে।

মোটেই না! কেন, আমার কথার মধ্যে কি ঐ ধরনের কোনো ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়েছে রাণীজী?

তুমি বন্দী, কাজেই আমি তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই বনহুর।

বেশ, তাই হোক।

এমন সময় রহমত সহ চন্দনা এসে দাঁড়ায় সেই কক্ষে। যে অনুচরটিকে দস্যুরাণী এদের আনার জন্য পাঠিয়েছিলো সেও এসে দাঁড়ায় একপাশে।

রহমত এবং চন্দনা রাণীর সম্মুখে লৌহবেষ্টনী মধ্যে প্রদীপ কুমারকে জমকালো পোশাকে বন্দী অবস্থায় দেখে অবাক হয়। তারা রাণীকে কুর্ণিশ জানানোর কথাও ভুলে যায়। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফিরে তাকায় দস্যুরাণীর মুখে। তাদের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

দস্যুরাণী বুঝতে পারে রহমত এবং চন্দনা তার কৌশলে বন্দী শালার বন্দীকে দেখে বিস্মিত হতবাক হয়ে পড়েছে। তাদের বিস্ময় দূরীকরণে দস্যুরাণী সজাগ হয়ে উঠলো। বললো সে—রহমত, যাকে আমার কৌশলে বন্দীশালার বেষ্টনীমধ্যে বন্দী দেখতে পাচ্ছো সে মন্থনার রাজপুত্র প্রদীপ কুমার নয়।

রহমত বলে উঠে—তবে কি.....

হাঁ, সম্মুখে বন্দী অবস্থা যাকে লক্ষ্য করছো তাকেই আমি সন্ধান করে ফিরছিলাম এবং তোমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম কান্দাই গিয়ে তাকে খুঁজে বের করো।

তাহলে.....

হাঁ, এই সেই যার জন্য চন্দনাকে আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর অভিনয় করেছি।

বলে উঠে চন্দনা—অভিনয়!

হাঁ, অভিনয়। চন্দনা, তুই ভাবতে পারলি আমি তোকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলাতে পারি? আমি তোর উপর মৃত্যুদন্ডাদেশ দিতে পারি?

তবে যে তুমি...

হাঁ, সব ছিলো আমার নিপুণ এক কৌশল। জানতাম, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার সাধ্য কারো নেই। আমার অনুচরদের উপর যদিও আমি তাকে গ্রেপ্তার করে আনার কঠিন আদেশ দিয়েছিলাম কিন্তু তারা কিছুতেই সক্ষম হবে না এও জানতাম। তাই আমি তোর মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ দস্যু বনহুর নিশ্চয়ই এ সংবাদে নিশ্চুপ থাকতে পারবে না। কারণ সে জানতো, আওরঙ্গকে আশ্রয় দিয়েছিলো চন্দনা এবং সেই অপরাধে তাকে হত্যা করা হচ্ছে, কাজেই ...এবার সব বুঝতে পেরেছো তোমরা। আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। আমি জয়যুক্ত হয়েছি।

চন্দনা রাণীর বুকে মাথা রেখে বলে উঠে—সত্যি তুমি বুদ্ধিমতী রাণী—সত্যি তুমি অদ্বিতীয়া!

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে। সে দস্যুরাণীর কথাগুলো সব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো। বুঝতে পারলো, তাকে বন্দী করার এক চরম কৌশল এঁটেছিলো দস্যুরাণী।

বললো এবার দস্যুরাণী—কি ভাবছো দস্যু বাহাদুর?

ভাবছি তোমার কৌশল ও বুদ্ধির কাছে আমি হেরে গেলাম।

স্বীকার করো এ কথা?

না করে উপায় কোথায়। যাক, তবু সিমকীর জন্য তুমি মৃত্যু দণ্ডাদেশ সত্যি কার্যকরী করোনি, সে ব্যাপারে আমি অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করছি।

সিমকীর জন্য তোমার অপরিসীম অনুভূতি ছিলো এবং আছে, কারণ তার স্বল্পবুদ্ধির সুযোগ নিয়েই তুমি আমার দুর্ভেদ্য ভূগর্ভ ঘাটির অভ্যন্তরে প্রবেশে সক্ষম হয়েছিলে।

সে কারণেই আমি নিজকে সৌভাগ্যবান মনে না করে পারিনি, যেহেতু এমন সুযোগ গ্রহণ সব সময় ভাগ্যে আসে না। সিমকীর অভিনয় আমাকে অভিভূত করেছিলো। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দস্যুরাণী ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বনহুরের মুখের দিকে।

চন্দনা কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো দস্যু বনহুরের মুখের দিকে। তার সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ও চেহারা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। এই সেই আওরঙ্গ, এটা যেন সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

দস্যুরাণী বুঝতে পারলো, চন্দনা আত্মহারা হয়ে পড়েছে। তাকে সজাগ করে তোলার জন্য বললো—চন্দনা, এবার তুমি যেতে পারো।

চন্দনা দস্যুরাণীর কথায় চমকে উঠলো, কারণ সম্বিৎ ফিরে এলো তার মধ্যে। একটু লজ্জিতও হলো সে ভিতরে ভিতরে। দস্যুরাণীকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলো চন্দনা সেই কক্ষ থেকে।

দস্যুরাণী এবার রহমতকে লক্ষ্য করে বললো—তুমিও যাও, রায়হান আস্তানায় জানিয়ে দাও আমার কাজ হাসিল হয়েছে।

বেরিয়ে যায় রহমত।

ওরা বেরিয়ে যেতেই বনহুর বলে—রাণীজী, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। যা সম্ভব নয় তুমি কৌশলে তা সম্ভব করেছো কিন্তু আমাকে আটকে রাখার মত শক্তি তোমার হবে না, এটাও জেনে রেখো রাণীজী। এ প্রচেষ্টা তোমার ব্যর্থতাই প্রমাণ করবে শেষ পর্যন্ত।

দস্যুরাণী ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করে উঠলো—আমার বন্দীশালা থেকে বের হওয়ার মত দুরাশা তোমার মনে দানা বেঁধেছে দেখে সত্যি আমি বিস্মিত না হয়ে পারছি না।

হেসে বললো বনহুর—তার প্রমাণ প্রদীপ কুমারের মুক্তিলাভ, এটা কি স্মরণ আছে রাণীজী?

অধর দংশন করে বললো দস্যুরাণী—আমার ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য আমি অনুতপ্ত না হয়ে নিজকে এ ব্যাপারে আরও সজাগ করে নিয়েছি। যার জন্য তোমার কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার।

কথাটা বলে দস্যুরাণী তার সুউচ্চ আসনের উপরে গিয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে পাদানিতে পা রেখে চাপ দিতেই সম্মুখস্থ লৌহশলাকা বেষ্টিত বন্দী শালা সহ বনহুর অদৃশ্য হলো।

দস্যুরাণী হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে।

❑

এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলো শয়তানের দল? বলো আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে এলে? যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বললো দিপালী।

সমস্ত শরীরে বেত্রাঘাতের কঠিন স্পষ্ট ছাপ। এলায়িত রুক্ষ তৈলহীন চুল। ছিন্নভিন্ন পরিধেয় বস্ত্র। জামাটা ছিঁড়ে পিঠের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। ঠোঁটের পাশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চোখ দুটো বসে গেছে হবে। চোখের দৃষ্টি সচ্ছ নয়, কেমন যেন ঘোলাটে, কারণ ক'দিন সে অনাহারী।

দু'জন বলিষ্ঠ পুরুষ তার দু'বাহু ধরে টেনে হিঁচড়ে এনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো আধো অন্ধকারময় একটি কক্ষে।

বলিষ্ঠ ব্যক্তিদ্বয়ের একজন বললো—এবার এখানে থাকো। যেমন কাজ করেছিলে তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করো।

দরজা বন্ধ করে চলে গেলো ওরা।

দিপালী শুকনো, কঠিন মেঝেতে মৃতবৎ পড়ে রইলো। আজ কয়েকদিন হলো সে বন্দী হয়েছে, তারপর থেকে তার উপর চলেছে নির্মম অত্যাচার অনাচার উৎপীড়ন। সমস্ত দিন ধরে তার উপর চলে নিষ্পেষণ, সন্ধ্যায় তাকে একটি নোংরা অন্ধকার কক্ষে রেখে যাওয়া হয়। তখন তাকে শুধু একটি শুকনো রুটির টুকরা খেতে দেওয়া হয়। তবু সে একা নয়, কয়েকটা কুকুর ছিলো তার সঙ্গী। যখন তাকে খাবার দেওয়া হতো তখন ছুটে আসতো ক্ষুধার্ত কুকুরের দলটি।

দিপালী কোনোদিন পেতো কোনোদিন পেতো না। যদিও এক টুকরা রুটি দিয়ে তার উদর পূরণের কোনো সম্ভবনাই ছিলো না, তবু ক্ষুধা নিবারণের উৎকট প্রচেষ্টা চালাতো সে।

প্রথম প্রথম দিপালীর খুব খারাপ লাগলেও পরপর ব্যাপারটা যেন গা সওয়া হয়ে গিয়েছিলো তার। কুকুরগুলোকে ভীষণ ভয় করতো সে, কিন্তু এখন আর তেমন ভয় করে না। আর ভয় করেই বা কি হবে, এরাই যে তার এখন সাথী।

কুকুরগুলোও প্রথম দিন অবাক হয়ে গিয়েছিলো তাদের নতুন এক সহচর দেখে। দিপালীকে লক্ষ্য করে ঘেউ ঘেউ করেছিলো খানিকক্ষণ ভীষণভাবে। দিপালী সহায় করুণ চোখে তাকিয়ে দেখছিলো, সে ভাবছিলো হয়তো ঐ ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো তাকে কাঁমড়ে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু কুকুরগুলো কিছুক্ষণ অবিরাম চিৎকার করলেও এক সময় তারা বুঝতে পারলো সেও তাদেরই একজন। কাজেই এক সময় ওরা নীরব হয়ে গিয়েছিলো কতকটা অনিচ্ছা সত্বেও।

দিপালীও যেন ওদের মেনে নিয়েছিলো বন্ধু বা সঙ্গী হিসেবে। এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে বারবার তাকাচ্ছিলো কুকুরগুলোর দিকে ওরা যেন ক্রমান্বয়ে তাকে সহ্য করে উঠবার চেষ্টা করছে।

হলোও তাই দিপালীকে কুকুরগুলো যেমন সঙ্গী হিসাবে মেনে নেবার চেষ্টা করে চলেছে তেমনি দিপালী নিজকেও ওদেরই একজন মনে করে নিয়ে চুপচাপ ছিলো। আর চুপ না থেকেই বা কি করবে— দশের এবং দেশের উপকার করতে গেলে এমনি নানা বিপদ আপদের সম্মুখীন হতেই হবে, এ কথা তার অজানা ছিলো না। আর ছিলোনা বলেই সে ব্যাপারে পা বাড়িয়েছে।

সমস্ত দিনটা তার কাটলো কুকুরগুলোর সঙ্গে। দিপালী প্রথম দিন ভেবেছিলো তাকে এমনি করে কুকুরগুলোর সঙ্গে আটকে রাখা হবে, হয়তো বা এই তার চরম শাস্তি। কিন্তু কয়েক ঘন্টা যেতে না যেতেই তাকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সেই কক্ষটা থেকে।

দিপালী সেদিন ভেবেছিলো হয়তো কুকুরগুলোর সঙ্গে এটাই তার প্রথম এবং শেষ দেখা। তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাও জানে না দিপালী তখন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলো সবকিছু। উপলব্ধি করলো তাকে এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেখানে ঐ কুকুরগুলোর মতও সহানূভুতিশীল হৃদয় নেই।

একটা বেশ বড়সড় ঘরে আনা হয়েছিলো সেদিন দিপালীকে। যদিও তখন রাতই ছিলো তবু ইলেক্ট্রিক আলোতে সব দেখতে পাচ্ছিলো সে ভালোভাবে। মূল্যবান জামা কাপড় পরিহিত মুখোসধারী কয়েক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত রয়েছে দেখেছিলো দিপালী। ভেবেছিলো কুকুরগুলোর পরিবর্তে এবার কিছু মানুষ তার সঙ্গী মিললো।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দিপালী বুঝতে পারলো, ঐ কুকুরগুলোর চেয়েও এই দু' পা-ওয়ালা জীবগুলো ভয়ঙ্কর এবং জঘন্য।

দিপালী যখন পুনরায় তার পূর্ব পরিচিত চতুষ্পদ জীবগুলোর মধ্যে ফিরে এলো তখন সে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার সমস্ত দেহটা যেন চলৎশক্তিহীন অসাড় হয়ে পড়েছে। দু' পা-ওয়ালা জীবগুলো তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো যেমনভাবে তাতে দিপালীর পক্ষে বেঁচে থাকাটাও যেন আশ্চর্য ছিলো।

যখন তার সম্বিৎ ফিরে এসেছিলো তখন সে দেখেছিলো নিজকে এক বীভৎস অবস্থায়। দেহে তার কোনো বস্ত্র ছিলো না, ছিলো না আবরণ জাতীয় কোন সম্বল। নিজের বিধ্বস্ত দেহটাকে দেখে শিউরে উঠেছিলো। এর চেয়ে চিরনিদ্রা তার জীবনে ছিলো পরম কাম্য।

কিন্তু জীবনটা যত হালকা মনে হোক আসলে তা নয়। দিপালীকে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়েছিলো।

সে কি অট্টহাসির হুল্লোড়।

দিপালী চোখ তুলতেই দেখতে পেয়েছিলো সেই দু পা-ওয়ালা জীবগুলোকে, যারা তার এ অবস্থা করেছে। মানুষ হলে ওরা এমনভাবে হাসতে পারতো না। কুকুরগুলোও না, এরা কুকুরগুলোর চেয়েও জঘন্য কোনো এক নাম না জানা জীব হবে। সত্যি সত্যি দিপালীর তখন তাই মনে হচ্ছিলো।

দিপালীর খুব কান্না পেয়েও সে কাঁদলো না। সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো, পাশে তাকালো, কারণ তার দেহখানা সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। হয়তো বা নিজের দেহখানাকে সে ঐ দু'পা-ওয়ালা জীবগুলোর শ্যেন দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখতে চাইলো। হঠাৎ নজরে পড়লো ওপাশে তারই পরিধেয় বসনগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে।

দিপালী অবাধ্য শিশুর মত ছুটে গেলো তার নিজের জামা কাপড়গুলো নেবার জন্য কিন্তু সে ঐ কাপড়গুলোর সম্মুখে পৌঁছবার পূর্বেই একজন দু'পা ওয়ালা জীব তুলে নিলো কাপড়গুলো হাতের মুঠায়।

দিপালী অসহায়ভাবে আঁকড়ে ধরলো লোকটাকে—দাও, আমার কাপড় দাও...

অট্টহাসি ভেসে এলো দীপালীর চারপাশ থেকে। হাসি তো নয় যেন এক একটা গনগনে সীসার বুলেট। তার দেহখানাকে যেন ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিলো।

দিপালী দু'হাতে নিজের দেহটাকে জড়িয়ে ধরে বসে পড়েছিলো এক অসহায় করুণ অবস্থায়।

চারদিকে কুৎসিত অট্টহাসির শব্দ।

একজন ডেকেছিলো, এই নাও তোমার পরিধেয় বস্ত্র। নিয়ে যাও সুন্দরী...

দিপালী বিশ্বাস করে উঠে দাঁড়ায়, পা বাড়াতেই লোকটা কাপড় খানা ছুঁড়ে দেয় অপর এক দু'পা-ওয়ালা জীবের দিকে।

দিপালী ছুটে যায় কাপড়খানা ধরার জন্য।

সেই সময় আবার শুনতে পায় সেই কুৎসিত হাসির শব্দ। দিপালী যেন মরিয়া হয়ে উঠে।

ওকে নিয়ে বেশ কিছু সময় চলেছিলো এক অভিনব কুৎসিত তামাশা। দিপালী তবু মরেনি, মরতে পারেনি কোনোক্রমে সেদিন। কুকুরগুলোর পাশে ফিরে এসে কতকটা আশ্বস্ত হলেও সমস্ত দেহটা যেন ওর জ্বালা করছিলো অসম্ভব রকম। একটা কোনো কিছু করবার উপায় থাকলে এ প্রাণ সে অনেক্ষণ নিঃশেষ করে ফেলতো যেমন নিঃশেষ হয়ে গেছে তার নারীত্ব।

কুকুরগুলোকে বন্ধুর চেয়ে কম মনে হয়নি সেদিন, কারণ ওরা দু'-পা-ওয়ালা জীবগুলোর মত ভয়ঙ্কর নয়। ওদের কাছে দিপালীর ভরসা আছে।

দিপালী তাকিয়ে ছিলো ওদের দিকে, দেখতে পেয়েছিলো ওরা কেমন সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে সম্মুখের দু'খানা পায়ের মধ্যে মুখ রেখে। ওদের দিকে তাকিয়ে অনেকটা ভরসা পেয়েছিলো দিপালী সেদিন।

এরপর থেকে প্রতিদিন দিপালীকে ওরা নিয়ে যেতো এবং ওর উপরে চালাতো নানা রকম অত্যাচার। কারণ সে দুস্কৃতিকারী চোরা চালানীদের সন্ধান দিয়েছিলো পুলিশ মহলে এটাই হলো তার অপরাধ।

ক্রমে দিপালী নেতিয়ে পড়েছিলো। প্রতিদিন তাকে নানাভাবে নির্যাতিত করা হতো। বেত্রাঘাতে জর্জারিত করা হতো তার নিটোল সুন্দর দেহটাকে। কুকুরগুলো আজকাল দিপালীর বন্ধুর চেয়েও আপন বনে গেছে। এখন তাকে

দেখলে ওরা উৎকট আওয়াজ করে না বরং লেজ নেড়ে তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়।

দিপালী তাই মাঝে মাঝে নিজের শুকনো রুটির টুকরো থেকে কিছুটা ছিড়ে কুকুরগুলোর মুখে গুঁজে দেয়, কিছুটা খায় সে নিজে। কোনো রকমে জীবটাকে জিইয়ে রাখে, না রেখে তো কোনো উপায় নেই। প্রাণটা বড় শক্ত, বেরুতে চায় না সহজে।

আজকাল কুকুরগুলোও যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে, হয়তো স্বল্প খাওয়ায় ওদের তৃপ্তি ঘটে না! যেমন দিপালীর বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে।

আর কতদিন দিপালী এমনভাবে এই নির্যাতন সহ্য করবে! কুকুর-গুলোকে আজকাল তার বড় ভাল লাগে, নিঃসঙ্গ জীবনের ওরা যেন সাথী-সঙ্গী। যখন দিপালী ফিরে আসে কুকুরগুলোর মধ্যে তখন সে অনেকটা সান্ত্বনা খুঁজে পায়। ওর মনে হয়, পশুদের মধ্য হতে এতক্ষণে বুঝি সে মানুষের মধ্যে ফিরে এলো।

দিপালী মেঝেতে কিছুক্ষণ মৃতের ন্যায় পড়ে রইলো। আজ তার উপর চলেছে অকথ্য অত্যাচার, নিপীড়ন যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাকে আজ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কতকগুলো জটিল প্রশ্ন তাকে করা হয়েছে যার জবাব দিতে সে হিমসিম খেয়ে গেছে। এছাড়া নতুন এক প্রস্তাব তার কাছে ওরা পেশ করেছে যা তাকে একেবারে মুষড়ে ফেলেছে। দু'পা-ওয়ালা জীবগুলো দিপালীর কাছে প্রস্তাব দিয়েছে, তুমি যদি আমাদের কাজে সহায়তা করবে বলে শপথ গ্রহণ করো তাহলে তোমার উপর আমরা সহানুভূতি জানাবো এবং তুমি হবে তখন আমাদেরই একজন। দিপালী রাজি হয়নি, তাই তার উপর আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে তিনগুণ বেশি অত্যাচার চলেছে। দেহের কোনো কোনো স্থানে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকার সেক দেওয়া হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত ওর দেহ, দেহের কোনো কোনো স্থানে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়ে রক্ত ঝরছে।

অনেকক্ষণ দিপালীকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে দেয়ালের পাশে ঝিমিয়ে পড়া কুকুরগুলো এগিয়ে আসে। সহানুভূতি জানিয়ে লেজ নাড়তে

থাকে ওরা—যেন বলছে, দুঃখ করোনা বোন, ন্যায়ের পথে জীবন বিলিয়ে দেওয়াতেও আত্মতৃপ্তি আছে।

নিঃশ্বাসের শব্দে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকায় দিপালী। এই নির্জন কারাকক্ষে কে এলো তার পাশে। চোখ মেলতেই অবাক হয় দিপালী দেখতে পায় কুকুরগুলো যারা এতক্ষণ ঐ দেয়ালের পাশে অন্ধকারে দু'পায়ের মধ্যে মুখ রেখে চুপচাপ শুয়েছিলো, তারাই উঠে এসেছে। দিপালীর নির্যাতিত করুণ অসহায় অবস্থা তাদের মনকে হয়তো ব্যথাকাতর করে তুলেছে, তাই ওরা নিশ্চুপ থাকতে চাইলেও পারেনি, ভাষাহীন মুখে সহানুভূতি জানাতে এগিয়ে এসেছে, যদি ওদের কিছু করবার থাকতো তবে না করে পারতো না।

❑

দিপালী যখন অন্ধকারাকক্ষে কয়েকটি কুকুরের সঙ্গে একত্রে কাল যাপন করছে তখন পুলিশ মহল দিপালীর সন্ধানে সমস্ত কান্দাই শহর চষে ফিরছে। যেখানেই সন্দেহ হচ্ছে সেখানেই তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছে কিন্তু সব জায়গায় তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে।

শুধু পুলিশ মহলই নয়, রহমান তার দলবলকে ছড়িয়ে দিয়েছে শহরের সর্বত্র। কোথায় আছে দিপালী, কোথায় তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কিভাবে তাকে আটকে রাখা হয়েছে কিংবা তাকে হত্যা করা হয়েছে কিনা, সবকিছুর সন্ধান করে চলেছে ওরা তন্ন তন্ন করে।

দিপালীর নিরুদ্দেশ বনহুরকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলো, সে তাকে খুঁজে বের করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগও নিয়েছিলো কিন্তু সময় হলো না। মন্থনা থেকে জরুরি এক সংবাদ পেয়ে বনহুরকে তখনই চলে যেতে হয়েছিলো। বনহুরের শপথ সিমকীকে রক্ষা করা।

বনহুর মন্থনায় রওয়ানা দেবার মুহূর্তে দিপালীকে খুঁজে বের করার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার রহমানের উপর তুলে দিয়ে গেছে।

রহমান তার চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

বনহুর মন্তব্য চলে যাবার পর কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি দিনের জন্যেও রহমান তার কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচর এক মুহূর্ত বিশ্রাম না করে সদাসর্বদা দিপালীর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে। চতুর্থ দিনে তারা যখন ফিরে এলো তখন নূরী এসে দাঁড়ালো তাদের সম্মুখে! রহমান ও তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করেই সে বুঝতে পেরেছিলো কাজ সমাধা হয়নি। দিপালীকে তারা নিশ্চয়ই খুঁজে পায়নি। কারণ তাদের মুখমণ্ডলে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো একটা হতাশা আর ব্যর্থতার ছাপ।

নূরী জিজ্ঞাসা করলো—রহমান, দিপালীর কোনো খোঁজ পেলে?

রহমান বসে পড়লো একটা পাথরখণ্ডে। ক্লান্তভাবে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে শুষ্ককণ্ঠে বললো—সর্দারের নির্দেশমত কাজ করেছি কিন্তু কোনো ফলই হলো না!

নূরী বললো—আমার মনে হয় তোমাদের সন্ধান করাটা ঠিকমত হচ্ছে না। আমাকে অনুমতি দাও আমি যাবো দিপালীর খোঁজ করতে।

রহমান বললো—নূরী, তুমি তাকে কোনোদিন দেখোনি, তার সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কেমন করে তুমি তাকে খুঁজে বের করবে?

তবু কথা দাও কাল আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে! বলো রহমান ভাই?

বেশ, কথা দিলাম।

নূরী যেন আশ্বস্ত হলো অনেকটা। দিপালী সম্বন্ধে সে বনহুরের মুখে কিছু কিছু জানতে পেরেছিলো, মেয়েটি বড় অসহায়। এ কথাও নূরী শুনেছিলো। তাই ওর প্রতি একটা আন্তরিক সহানুভূতি জেগে উঠেছিলো তার মধ্যে।

নারীর প্রতি নারীর যে একটা অন্তরের টান আছে, এ কথা কোনো নারীই অস্বীকার করতে পারবে না। হয়তো এ কারণেই নূরীর প্রাণ দিপালীর জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো।

পরদিন রহমান আস্তানার বাইরে পা বাড়াতেই একটি তরুণ এসে তাকে অভিবাদন জানালো।

রহমান চমকে উঠলো ভীষণভাবে কিন্তু পরক্ষণেই সে মৃদু হেসে বললো—নূরী; যত ছদ্মবেশই ধারণ করো আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। যেতে যখন চাইছো তখন নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি নিয়ে না গেলেও আমি তোমাকে অনুসরণ করতাম।

জানিনা তার ফল কি হবে।

তুমি আমার জন্য কিছু ভেবো না, আমি বনহুরের মুখে দিপালী সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি তাতেই আমি আমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবো।

বেশ, চলো।

রহমান আর নূরী আস্তানার বাইরে বেরিয়ে এলো, দুটো অশ্ব পাশাপাশি অপেক্ষা করছিলো। একটি অশ্বে রহমান অপর অশ্বে নূরী চেপে বসলো।

কান্দাই জঙ্গল অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে ওরা দু'জন।

বেলা দ্বিপ্রহর হলেও সূর্যের আলো তেমন প্রবেশ করে নি এ বনে। বহুকালের পুরোন নাম না জানা বিরাট বৃক্ষগুলো এক একটা দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

গহন বনের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে দূরে অনেক দূরে লোকালয়ের দিকে। ঐ পথ ধরে কোনোদিন কোনো পথিক কান্দাই জঙ্গলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি, হয়তো করবেও না কোনোদিন। এ পথ শুধু তাদেরই যারা কান্দাই জঙ্গলের আদি বাসিন্দা।

বনহুর এ পথে চলে।

চলে তার অনুচরগণ আর চলে জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তুগুলো।

রহমান আর নূরীর অশ্বপদশব্দ ক্রমান্বয়ে মিশে যায় কান্দাই জঙ্গলের গহ্বরে।

দস্যুরাণীর কারাকক্ষ।

কৌশলে বনহুরকে বন্দী করেছে দস্যুরাণী। এত সহজে তাকে বন্দী করতে পারবে ভাবতে পারেনি সে। দস্যুরাণী তার অনুচরদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে, দীর্ঘ এক সপ্তাহব্যাপি মন্থনা আস্তানায় আনন্দোৎসব চলবে।

যে দস্যু বনহুরকে পুলিশ মহল বন্দী করতে সক্ষম হয়নি, যে দস্যু বনহুরকে ষড়যন্ত্রকারী দল আটক করতে পারেনি, যাকে বন্দী করার মত দুঃসাহস হয়নি জবরু সর্দারের, যাকে আটক রাখতে পারেনি হাঙ্গেরী কারাগার, মায়াচক্রীর মায়াজাল যাকে সম্মোহিত করতে পারেনি সেই দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুরকে অতি সহজে অতি কৌশলে বন্দী করেছে দস্যুরাণী। এ শুধু তার জীবনে চরম জয়লাভই নয়, পরম সৌভাগ্য। বিশ্ববাসী জানবে দস্যুরাণী কত শক্তিমান, কত বুদ্ধিমতী নারী।

দস্যুরাণী দরবারকক্ষ থেকে ফিরে এলো তার বিশ্রামকক্ষে। পাশে চন্দনা তার পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে এলো।

দস্যুরাণী মুখের কালো আবরণ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসে পড়লো একটা সোফায়। আনন্দসূচক শব্দ করে বললো—চন্দনা, জীবনে এমন সার্থকতা কমই এসেছে। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে আমি বিশ্বে নতুন এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছি।

সত্যি তুমি বুদ্ধিমত্তায় অদ্বিতীয়। কোনো শক্তি যাকে বন্দী করে রাখতে পারেনি তুমি তাকে বন্দী করেছো। তোমাকে কি করে যে অভিনন্দন জানাবো.....

থাক, অত বাহবা চাই না। শোন্ একবার ঐ বিশ্ববিখ্যাত দস্যুটার কারাকক্ষে যাবো।

সর্বনাশ!

ভয় হচ্ছে নাকি?

রাণী, তুমি পাশে থাকতে ভয় বলে কিছু জানি না। কিন্তু ওকে দেখলে আমার যেন কেমন মনে হয়।

চন্দনা, তুই দস্যুরাণীর সহচরী তোর মন নড়বড়ে হলে চলবে না। কঠিন হতে হবে তোকে। একটু হেসে বলে—ওকে বুঝি তোর খুব পছন্দ হয়?

যাও রাণী, যা তা বলো না।

তবে যে বলেছিলি ওকে দেখলে মন তোর কেমন করে।

রাণী, তুমি কি বলতে চাও আমি ওর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবো?

মুগ্ধ নয় চন্দনা, অভিভূত.....

যাও।

অসম্ভব কিছুই নয় চন্দনা। দস্যু বনহুরের যে রূপ তাতে যে কোনো নারী অতি সহজেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

তুমি কি বলতে চাও তোমার আহাদ চৌধুরীর চেয়েও বনহুর বেশি সুন্দর?

হেসে উঠে দস্যুরাণী—অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিস চন্দনা।

সত্য করে বলো তো?

যার প্রিয়তম তারই কাছে সে সবচেয়ে বেশি সুন্দর। যাক বন্দীকে নিয়ে বেশি আলোচনা না করাই শ্রেয়। একটু থেমে বলে—চন্দনা!

বলো?

সত্যি কি হীরাবাঈ বাল্য বিধবা?

আমি জানি দস্যু বনহুর মিথ্যা বলে না।

তবে সে আমার কাছে কেন এসব কথা গোপন করেছিলো?

হয়তো কোনো কারণ ছিলো।

বনহুর বলেছে তাকে সে দ্বিতীয় বার বিয়েও দিয়েছিলো।

হাঁ, সে কথাও সত্য।

কিন্তু হীরা যে দস্যু বনহুরের প্রেমে আত্মহারা।

রাণী, শুনেছি দস্যু বনহুরকে যে একবার দেখেছে সেই তাকে ভালবেসেছে। জানি না তার মধ্যে কি একটা যাদু লুকানো আছে।

চন্দনা।

বলো?

এটুকু মনে রাখিস্ আমার কারাকক্ষ থেকে সে আর বাইরে যেতে সক্ষম হবে না। তাকে আমি আজীবন আটকে রাখবো যেন সে কোনো নারীর মন নিয়ে খেলা করতে না পারে।

তাহলে তুমি হীরাবাঈকে উপহারস্বরূপ ওকে দেবেনা?

না।

কেন?

হীরা মিথ্যা কথা বলেছে আমার কাছে। যে বিবাহিতা তার পক্ষে অপর এক পুরুষকে ভালবাসা অপরাধ, শুধু অপরাধই নয় মহাপাপ। দস্যু বনহুর ঠিকই বলেছে, হীরাবাঈ যা কামনা করে তার কোনোদিনই সম্ভব নয়। চল যাই, ওকে দেখে আসি এখনও ওর সেই গর্ব আছে না নেতিয়ে পড়েছে।

চন্দনা ও দস্যুরাণী পা বাড়ালো কারাকক্ষের দিকে।

দুর্গম অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে একসময় পৌঁছে গেলো তারা কারাকক্ষের পাশে।

পথ দুর্গম হলেও দস্যুরাণী আর চন্দনা অতি সহজেই এই পথ অতিক্রম করে এসেছে। কারণ রাণীর এবং রাণীর সহচরদের জন্য অদ্ভুত এক লিফ্‌ট ছিলো। সেই লিফ্‌টে চেপে পেরিয়ে আসতে হয় দুর্গম পথটা।

রাণী এসে দাঁড়াতেই কারাকক্ষের প্রহরীদ্বয় অভিবাদন জানালো।

বনহুর তখন কারাকক্ষে বসেছিলো চুপচাপ। সমস্ত শরীরে তার লৌহশিকল বাঁধা। দস্যুরাণী এবং চন্দনার উপস্থিতি লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়ালো সে এবং অভিবাদন জানালো দেহখানাকে অর্ধানমিত করে। দস্যু বনহুরের অভিবাদনে দস্যুরাণী খুশি না হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, সিংহীর চোখের মত জ্বলে উঠলো তার চোখ দুটো।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো—তোমার অভিবাদন আমি গ্রাহ্য করি না, কারণ তুমি আমার বন্দী।

হেসে বললো বনহুর—তুমি যখন আমার বন্দী হবে তখন তুমি যেন আমাকে সম্মান দেখাতে ভুলে না যাও, এ কারণে আমি.....

গর্জে উঠলো দস্যুরাণী—এত বড় স্পর্ধা তোমার—আমাকে তুমি বন্দী করবে, এ কথা তুমি উচ্চারণ করতে পারলে?

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে বনহুর।

দস্যুরাণী এবং চন্দনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আজ তিনদিন বন্দী থেকেও যার মধ্যে আসেনি এতটুকু পরিবর্তন। পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক রয়েছে সে, অবাক না হয়ে পারে না যেন দস্যুরাণী। ভীষণ রাগ হয় ওর উপর।

দস্যুরাণী ক্রুদ্ধভাবে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বলে উঠে বনহুর—রাণীজী শুনলাম তুমি সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসবের আয়োজন করেছো? একটু থেমে বললো—আমাকে এই আনন্দোৎসবে যোগ দেবার সুযোগ দেবে না?

দস্যুরাণী বনহুরের কথায় আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, কোনো কথা না বলে সে চন্দনাসহ বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় একবার তীব্রভাবে তাকিয়ে দেখে নিলো দস্যুরাণী বনহুরকে।

দস্যুরাণী ফিরে গিয়ে তার দরবারকক্ষে হাজির হলো। তক্ষুণি সে ডাক দিলো তার প্রধান অনুচর রহমতকে।

ছুটে এলো রহমত হন্তদন্ত হয়ে, কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো—কি হুকুম রাণীজী?

দস্যুরাণী বললো—বনহুরকে সমস্ত দিন কিছু খেতে দেবে না। সন্ধ্যায় তাকে একখানা রুটি শুধু খেতে দেবে। তারপর আনন্দোৎসব চলাকালে

তাকে তার বন্দীশালায় প্রতিদিন একঘন্টা বেত্রাঘাত করবে। যেন বুঝতে পারে সে বন্দী.....

আচ্ছা রাণীজী।

যাও তোমরা আনন্দোৎসব শুরু করে দাও। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায় রহমত।

দস্যুরাণী পায়চারী করতে থাকে।

চন্দনা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করছিলো দস্যুরাণীকে। দস্যুরাণী মাঝে মাঝে অধর দংশন করছিলো।

চন্দনা বুঝতে পারছে, বনহুরের কথা সে সহ্য করতে পারছে না, তাই সে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

চন্দনা কোনো কথা বলার সাহস পেলো না, সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

দস্যুরাণী পায়চারী বন্ধ করে বললো—চন্দনা, এতবড় সাহস আমার সম্মুখে আমাকে বন্দী করবে বলে সে গর্বিত উক্তি উচ্চারণ করতে পারলো?

রাণী, তুমি মিছামিছি বেশি উত্তেজিত হচ্ছো। বন্দী অবস্থায় মানুষ উন্মাদসম বিবেচিত হয়। সে তখন বিকারগ্রস্তের মত যা তা উচ্চারণ করে থাকে। তুমি বন্দীর কথা গায়ে মেখো না।

আমি বনহুরকে বন্দী করে তার প্রতি কোনোরকম অনাচার করিনি। তবু সে.....না, তাকে আমি সমুচিত শাস্তি দেবো। দস্যুরাণী রাগে ক্ষোভে অগ্নিবর্ণ ধারণ করে।

❑

দস্যুরাণী সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট।

পাশে দণ্ডায়মান চন্দনা।

রহমত এবং কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচরও রাণীজীর আসনের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

সম্মুখে নেচে চলেছে দু'জন নর্তকী।

সমস্ত দরবারকক্ষ আলোয় ঝলমল করছে। একদল অনুচর অদ্ভুত ধরনের বাজনা বাজিয়ে চলেছে।

দরবারকক্ষটি নাচেগানে ভরপুর।

দস্যুরাণীর দু'চোখে আনন্দের উচ্ছলতা। দস্যুরাণীর খুশিতে সবাই খুশি। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে, এটা তাদের কম গর্বের কথা নয়। দস্যুরাণীর পিছনে চাঁদোয়ায় অসংখ্য তারার ফুলের মত আলোর ফুলঝুরি ঝরছে। ঠিক দস্যুরাণীর পিছন অংশে মাথার পাশে চাঁদের আকারে বিরাট আকার আলোর বাল্‌ব জ্বলছে।

দস্যুরাণীর সমস্ত দেহে মণিমুক্তাখচিত পোশাক। কিন্তু শাড়ি গাগড়া বা সালোয়ার কামিজ নয়। প্যান্ট এবং আঁটসাট পোশাক। কতকটা শিকারীর ড্রেসের মত। পায়ে হাঁটু অবধি ভারী বুট। কোমরের বেল্‌টে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা এবং রিভলভার।

দস্যুরাণীর মাথায় ক্যাপ।

ক্যাপখানা দিয়ে মুখের কিছু অংশ ঢাকা পড়েছে।

অদ্ভুত সুন্দর লাগছে দস্যুরাণীকে।

দস্যুরাণী যখন দরবারকক্ষে আসার জন্য সজ্জিত হচ্ছিলো, তখন চন্দনা হেসে বলেছিলো—রাণী, আজ তোমাকে অপূর্ব লাগছে। যদি মিঃ চৌধুরী আজ পাশে থাকতেন.....

যাঃ তুই বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস্ চন্দনা।

সত্যি, কতদিন তুমি মিঃ চৌধুরীকে দেখোনি। ঠিক করে বলোতো, তোমার মন কেমন করছে না তাঁর জন্য?

মাথায় ক্যাপটা ঠিকমত বসিয়ে আয়নায় নিজকে লক্ষ্য করে দস্যুরাণী বলেছিলো—মনের কথা শোনার সময় আমার নেই। তবে হাঁ, মিঃ চৌধুরী একখানা চিঠি দিয়েছিলো কিন্তু আমি তার সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারিনি।

চন্দনা বলেছিলো—তোমার ভারী অন্যায় হয়েছে। সব কাজের আগে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে তোমার দেখা করা উচিত ছিলো।

হেসে বলেছিলো দস্যুরাণী—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম, তাই.....

এবার তো তোমার শপথ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছো, দস্যু বনহুর তোমার কারাগারে বন্দী। কবে যাবে বলো তো?

সময়মত যাবো।

কথাটা সংক্ষেপে শেষ করে দস্যুরাণী দরবারকক্ষের দিকে পা বাড়িয়েছিলো।

চন্দনাও নীরবে অনুসরণ করেছিলো ওকে।

দস্যুরাণীর দরবারকক্ষে প্রবেশ করলে তার অনুচরগণ একুশবার তোপধ্বনি করেছিলো।

যদিও পৃথিবীর তলদেশে চলেছিলো এ আনন্দোৎসব, তবু মন্থনার মাটি কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো সবার অলক্ষ্যে বারবার।

দস্যুরাণী আসন গ্রহণ করার পর তোপধ্বনি শেষ হয়েছিলো।

খুশি হয়েছিলো দস্যুরাণী অনুচরদের এই মহানন্দ পরিবেশে যোগ দিয়ে। মন্থনার আস্তানায় এমন আনন্দোৎসব এই ছিলো প্রথম।

অপূর্ব এই উৎসব।

বনহুর কারাকক্ষে বসে শুনতে পাচ্ছিলো তোপধ্বনির ভয়ঙ্কর বিকট আওয়াজ। কারাকক্ষের লৌহ দেয়ালগুলো যেন থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। তার সঙ্গে ঝনঝন করে বেজে উঠছিলো বনহুরের দেহের শিকলগুলো।

বনহুর উপলব্ধি করেছিলো এ আনন্দ উৎসবের মহা হুল্লোড়। কারণ তার কারাকক্ষের প্রহরীরাও শরাব পান করে ঢলঢল হয়ে পড়েছে। কেউ বা গান গাইছে, কেউ বা নাচতে শুরু করেছে, আমার কেউ কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে শরাবের বোতলগুলো গড়িয়ে দিয়ে তার সঙ্গে।

বনহুর মৃদু মৃদু হাসছিলো, কারণ সে জানে, তার অনুচরগণও তার অলক্ষ্যে এমনি করেই আনন্দে মেতে উঠে। তখন তারা ভুলে যায় সর্দারের কঠিন আইনকানুন। মনে পড়ে নিজ আস্তানার কাথা...সেবার কোনো এক আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছিলো তার অনুচরগণ। সারা দিনরাত অবিরত নাচগান আর বাজি-তামাশার রংবাজি চলেছিলো ভূগর্ভে। হঠাৎ বনহুর কোনো কারণে সেখানে গিয়ে পড়েছিলো। তখন অনুচরগণ ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলো, কারণ তারা শরাব পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো।

দস্যুরাণী যদি এসে পড়ে এই মুহূর্তে, তাহলে ঠিক এদের অবস্থা তেমনি হবে...

কিন্তু দস্যুরাণী তখন তার দরবারকক্ষে আনন্দোৎসবে আত্মহারা। ঠিক আত্মহারা নয়, কারণ আজ তার মনে বারবার জেগে উঠছিলো আহাদ চৌধুরীর কথাগুলো। "রাণী, তোমার জন্য অপেক্ষা করবো, ঠিক সময়মত আসবে।" মনে পড়ে আরও অনেক স্মৃতি যা মিঃ চৌধুরীকে স্মরণ করিয়ে দেয় রক্তে আঁকা ম্যাপের সন্ধানে যখন মিঃ বার্ডের সঙ্গে মিঃ আহাদ চৌধুরী হিন্দোল জঙ্গল অতিক্রম করে চলেছিলো তখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিলো আহাদ চৌধুরীর সঙ্গে। ঠিক সাক্ষাৎ নয়, আড়াল থেকে দস্যুরাণী দেখেছিলো তাকে। মিঃ আহাদ চৌধুরী বিশ্ববরেণ ডিটেকটিভ। মিঃ বার্ডের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন তিনি তবে আপন ইচ্ছায় নয়, মিঃ বার্ডের অনুরোধে। মিঃ বার্ড পেয়েছিলেন একটি ম্যাপ। ম্যাপখানা ছিলো কালি বা রং দিয়ে আঁকা নয়, রক্ত দিয়ে আঁকা ছিলো সে ম্যাপখানা। দস্যুরাণীর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে সে দিনের স্মৃতিগুলো। গহন জঙ্গলে তাঁবুর মধ্যে পাশাপাশি কয়েকজন বসে রক্তে আঁকা ম্যাপখানা দেখছিলেন। তাঁরা হলেন মিঃ বার্ড, মিঃ আহাদ চৌধুরী, আর ছিলো মিঃ বার্ডের একমাত্র কন্যা মিস ক্যাথলিন। দস্যুরাণী হিংস্র জীব থেকে আত্মরক্ষা করে অতি গোপনে এসে দাঁড়িয়েছিলো তাঁবুর বাইরে, একটি ছিদ্র দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছিলো তাঁবুর ভিতরটা। ঐ মুহূর্তে প্রথমেই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিলো মিঃ আহাদ চৌধুরীর দিকে। যদিও তার লক্ষ্য হলো টেবিলের ম্যাপখানা। তাঁবুর মধ্যে আগুনের বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা তার ভাল লেগেছিলো। দস্যুরাণী জানতো, তার বাবা দস্যু মরেন এই ম্যাপখানার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। যেমন করে হোক ঐ রক্তে আঁকা ম্যাপখানা তার চাই। ম্যাপখানার গোপন রহস্য যে জানতো, আর জানতো বলেই সে পিছু নিয়েছিলো মিঃ বার্ডের। দস্যুরাণীও এসেছিলো ঐ ম্যাপখানা হস্তগত করার অভিসন্ধি নিয়ে কিন্তু মনোভাব পালটে গিয়েছিলো তার যখন সে মিঃ আহাদ চৌধুরীর মোহময় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলো। দস্যুরাণী মিঃ চৌধুরীর তখন সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো।

হিন্দোল জঙ্গল ছিলো অতি ভয়ঙ্কর স্থান। দিনের বেলায় কোনোদিন সে জঙ্গলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতো না। শত শত বছর ধরে সেখানের মাটি দিনের আলো থেকে ছিলো বঞ্চিত।

এই গহন জঙ্গলেই ছিলো তখন দস্যুরাণীর বিচরণ। রুহীর পিঠে চেপে সে সারাক্ষণ চষে ফিরতো হিন্দোল বন থেকে কোহেন পর্বত। যে কোহেন পর্বতের একটি নিভৃত গুহায় মিঃ বার্ড পেয়েছিলো রক্তে আঁকা ম্যাপখানা। রাণীর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে কোহেন পর্বতের সেই গুহাটি, যে গুহায় অর্ধমৃত এক ব্যক্তি ধুঁকছিলো মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। মিঃ বার্ডের মুখে কাহিনীটা শুনেছে দস্যুরাণী। রক্তে আঁকা ম্যাপ একটি কাহিনী, যে কাহিনীর পিছনে রয়েছে গভীর এক রহস্য। আজ নতুন করে রাণীর মনে সেই বহুদিন আগের স্মৃতিগুলো ছায়াছবির মত ভেসে উঠছিলো।

হঠাৎ রাণীর চিন্তাধারায় বাধা পড়ে।

সম্মুখে নর্তকীর নাচ থেমে যায়।

মুহূর্তে দস্যুরাণীর কানে ভেসে আসে একটি গম্ভীর কঠিন কণ্ঠস্বর—খবরদার, কেউ এক পা নড়বে না।

দস্যুরাণী তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়ায় কিন্তু কোমরের বেল্‌ট থেকে রিভলভার খুলে নিতে পারে না। তার পূর্বেই সে দেখতে পায় তার দরবারকক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে জমকালো একটি মূর্তি। জমকালো মূর্তির দু'হাতে দুটি আগ্নেয় অস্ত্র।

দস্যুরাণীর চোখ দুটো মশালের আলোতে জ্বলে উঠলো যেন।

কঠিন কণ্ঠে বললো রাণী—কে? কে তুমি?

জমকালো মূর্তির মুখমণ্ডলের অর্ধেক ঢাকা অবস্থায় ছিলো, তাই তার মুখ সম্পূর্ণ দৃষ্টি গোচর হচ্ছিলো না।

জমকালো মূর্তি পূর্বের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি কে সে পরিচয় পাবে পরে। এখন তোমরা সবাই আমার বন্দী, একচুল কেউ নড়বে না।

রহমত তাকালো দস্যুরাণীর মুখের দিকে, তার মনোভাব এখন কি করা কর্তব্য জানতে চায় সে। দস্যুরাণী জানে, এ মুহূর্তে জমকালো মূর্তিকে আক্রমণ করলে তার হস্তস্থিত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে কয়েকজনকে প্রাণ দিতে

হবে। দস্যুরাণী তাই কোনোরকম আদেশ না দিয়েই নিজে সুউচ্চ আসন ত্যাগ করে নেমে এলো।

দরবারকক্ষ নীরব।

একটি সূচ পতনের শব্দ ও শোনা যাবে।

দস্যুরাণী দৃঢ় পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো দরবারকক্ষের মেঝেতে, দাঁতে দাঁত পিষে বললো—কেমন করে তুমি এই ভূগর্ভ দরবারকক্ষে প্রবেশ করলে বলো? ঠিক ঐ মুহূর্তে দস্যুরাণী ইংগিত করলো রহমত এবং অন্যান্য অনুচরকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো রহমত ও দলবল যারা এতক্ষণ দরবারকক্ষের আনন্দোৎসবে আত্মহারা হয়েছিলো তারা জমকালো মূর্তিটাকে।

শুরু হলো ভীষণ লড়াই।

অবশ্য জমকালো মূর্তি আগ্নেয় অস্ত্র এই মুহূর্তে ব্যবহার করলো না! সে আগ্নেয়াস্ত্রে বাঁটের দ্বারা এক একজনকে ধরাশায়ী করে চললো।

সমস্ত দরবারকক্ষ একটি লড়াইক্ষেত্রে পরিণত হলো। দস্যুরাণী নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে, কারণ সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় দ্রুত প্রস্তুতি নিতে পারেনি কিংবা অনুচরদের নির্দেশ দেবার সুযোগ পায়নি।

আশ্চর্য হয়েছে দস্যুরাণী, দরবারকক্ষের জ্বলন্ত মশালগুলো নিভে গেলো দপ দপ করে।

সমস্ত দরবারকক্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। দস্যুরাণীর অনুচরগণও কেউ গুলি ছুঁড়তে পারলো না, কারণ শত্রু একজন আর সমস্ত দলবল তারা নিজেরাই। গুলি ছুঁড়লে মরবে নিজেরাই তাই তারা শুধু ধস্তাধস্তি করে চলেছে।

কিছুই দৃষ্টি গোপন হচ্ছে না দস্যুরাণীর।

সব নিকষ অন্ধকার।

শুধু আর্তনাদ আর ধস্তাধস্তির শব্দ।

দস্যুরাণী যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে, সে ভাবতেই পারেনি এমন ধরনের একটা কাণ্ড ঘটাতে পারে, বিশেষ করে তার ভূগর্ভ আস্তানায় কারো

সাধ্য ছিলো না প্রবেশ করে। কিন্তু ভূগর্ভ ভেদ করে যেন আর্বিভাব ঘটেছিলো জমকালো মূর্তির।

অন্ধকারে দস্যুরাণী দু'খানা বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ অনুভব করলো— শুধু স্পর্শ নয়, দু'খানা বলিষ্ঠ হাত তাকে তুলে নিলো কাঁধে।

দস্যুরাণীও কম শক্তিশালিনী ছিলো না তবু সে দুটি বলিষ্ঠ হাতের কাছে পরাজয় বরণ করলো, একটুও নড়তে পারলো না সে।

একখানা রুমাল দিয়ে মুখটা তার বাঁধা হয়ে গেছে। হাত-পা ছুড়েও কোনো কিছু করতে পারলো না দস্যুরাণী। অন্ধকারে সে অনুভব করলো দুটি বলিষ্ঠ হাত তাকে তার দরবারকক্ষের বাইরে নিয়ে এলো। যদিও চোখ দু'টো মুক্ত ছিলো তবু কিছু নজরে পড়ছে না। জমাট অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। আরও অনুভব করলো দস্যুরাণী তাকে সুড়ঙ্গপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!

কে এই লোক যে দস্যুরাণীকে এমনভাবে কাবু করতে পারে? দস্যুরাণী নিজেও যেন ভেবে পাচ্ছে না। চিৎকার করবে তারও কোনো উপায় নেই, মুখখানা তার শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। অহেতুক হাত পা ছুঁড়ে কোনো ফল হবে না তবু সে কোনোক্রমে একখানা হাত-কোমরের বেল্‌টে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো। যদি সে একটি হাত সে কোমরের বেল্‌টে নিয়ে যেতে সক্ষম হতো তাহলে দেখে নিতো কে এই বীর পুরুষ।

দস্যুরাণীকে কাঁধে নিয়ে সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। জমকালো মূর্তিটি।

ক্রমান্বয়ে দরবারকক্ষের কোলাহল মিশে আসছে দস্যুরাণীর কানে। শুধু ভারী বুটের শব্দ ছাড়া আর সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

দস্যুরাণী বুঝতে পারছে, যে সুড়ঙ্গপথে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা তারই ভূগর্ভস্থ আস্তানার সুড়ঙ্গপথ।

দস্যুরাণী হাত দিয়ে জমকালো মূর্তির পিছন অংশের জামা টেনে ছিড়ে ফেলার চেষ্টা করছিলো এবং নিজকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে!

কিন্তু এতটুকু শিথিল করতে পারলো না সে বলিষ্ঠ দুটি হাতকে।

ক্রমান্বয়ে দস্যুরাণীর দেহটা যেন শিথিল হয়ে আসছে। অবিরত সে হাত পা ছুড়ছে বলিষ্ঠ হাতের বন্ধনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা চালিয়েছে।

সুড়ঙ্গপথে কেউ বাধা দিতে এলো না জমকালো মূর্তিটাকে। দস্যুরাণী আশা করেছিলো তার অনুচরগণ তাকে মুক্ত করে নেবে কিন্তু সুড়ঙ্গপথে কোনো রকম বাধাই এলো না।

এক সময় সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে এলো জমকালো মূর্তি। চারদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। ঠান্ডা বাতাসের হিমেল পরশে দস্যুরাণী বুঝতে পারলো ভূগর্ভ আস্তানার গোপন সুড়ঙ্গপথ শেষ হয়ে গেছে।

এবার দস্যুরাণীর কানে ভেসে এলো একটি শিষ দেবার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো অশ্বপদশব্দ। নিকটে কোথাও কোনো অশ্ব যেন প্রতীক্ষা করছিলো, শিষ দেবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এলো বলেই মনে হলো তার।

জমকালো মূর্তি এবার তাকে সহ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো। মুহূর্তে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো অশ্বটি।

জমকালো মূর্তি দস্যুরাণীকে বাম হস্তে এঁটে ধরে ডান হস্তে অশ্বের লাগাম টেনে ধরলো।

ঠিক ঐ সময় শোনা গেলো একসঙ্গে প্রায় অসংখ্য অশ্বপদশব্দ।

দস্যুরাণী বুঝতে পারলো তার অনুচরগণ অশ্ব নিয়ে শত্রুর পিছু ধাওয়া করেছে, এবার নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করতে ওরা সক্ষম হবে।

জমকালো মূর্তিও দস্যুরাণীসহ অশ্বটি তখন বেগে ছুটে চলেছে।

পিছনে অগণিত অশ্বপদ শব্দ জেগে উঠছে।

জমাট নিকষ অন্ধকারে পাথুরিয়া মাটিতে এক অদ্ভুত প্রতিধ্বনি।

সম্মুখের অশ্বটি অন্ধকারে মিশে গেছে যেন।

আকাশে তারার মালা পিট পিট করে জ্বলছে কিন্তু সে আলোতে বিশ্বের জমাট অন্ধকার যেন আরও গাঢ় মনে হচ্ছে।

মন্থনা দ্বীপের পূর্বাঞ্চল ধরে শুধু পাথুরিয়া মাটি। শক্ত কঠিন মাটি ভেদ করে স্থানে স্থানে পেঙ্গুইন নামক এক ধরনের বৃক্ষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বৃক্ষগুলো ঠিক শালগাছের মত দেখতে এবং তেমনি বৃহৎ আকার। কত যুগ যুগ ধরে যে এই পেঙ্গুইন বৃক্ষ মন্থনার পূর্বাঞ্চলে সজাগ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে কেউ তা বলতে পারবে না। মন্থনার প্রবীণ ভীল সর্দার আলমাও বলতে পারবে না এ গাছগুলোর জন্ম কবে কেমন করে হয়েছে।

ভীল সর্দার আলমার বয়স একশোর উপর। শক্ত-কঠিন মজবুত দেহ, যেন পাথর খুদে খুদে তৈরি করা একটি প্রস্তরমূর্তি।

পেঙ্গুইন বনের মধ্যে ছোট ছোট পাথুরিয়া টিলা! কতকগুলো বেশ বড়ও আছে, প্রায় ছোটখাট পাহাড়ের মত দূর থেকে দেখা যায়।

ভীল সর্দার আলমার বাস ছিলো একসময় সাগরের মধ্যে সিবিয়া দ্বীপে। দ্বীপ নয় যেন একটি অর্ধ জলমগ্ন কচ্ছপ। ছোট্ট দ্বীপ সিবিয়ায় গুটিকয়েক বাসিন্দা নিয়ে কোনরকমে বাসবাস করতো সে। কিন্তু ঈশ্বরের যেন আলমার এটুকু সুখ-সাচ্ছন্দ্য সহ্য হলো না। একদিন ঠিক কচ্ছপের মতই ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলো সিবিয়া।

আলমা তখন তার দলবল নিয়ে কোনোরকমে আশ্রয় নিয়েছিলো মাছধরা ডিংগিনৌকাগুলোর উপর। এ নৌকাগুলোই ছিলো সিবিয়া দ্বীপবাসীদের একমাত্র সম্বল।

এরা দিশেহারা হয়ে এসে উঠেছিলো মন্থনা দ্বীপে। আশ্রয় নিয়েছিলো। পেঙ্গুইন গাছের তলায়। সেখানে ওরা গড়ে তুলেছিলো ছোট্ট ছোট্ট গুহা পাথুরে টিলার মধ্যে।

মন্থনা দ্বীপের পুর্বাঞ্চলে বড় বেশি লোকজনের যাতায়াত ছিলো না। লোকালয় বলতে কিছু ছিলো না সেখানে। এ অঞ্চলে আলমা তাই অতি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস শুরু করে দিয়েছিলো।

গভীর রাতে অসংখ্য অশ্বপদশব্দ তাকে সজাগ করে তোলে। নিদ্রা ভেংগে যেতেই আলমা বেরিয়ে আসে গুহার বাইরে।

সর্দারকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে তার সহচরগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে, কারণ এ অঞ্চলে প্রায়ই হিংস্র জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটতো এবং আলমার দলবলকে নৃশংসভাবে হত্যা করতো।

আজও তারা মনে করে এমনি কিছু একটা ঘটেছে। তাই সবাই বেরিয়ে আসে সর্দারের সঙ্গে।

আলমা বৃদ্ধ।

দেহটা সম্পূর্ণ বেঁকে না গেলেও শালবৃক্ষের বাঁকা খুঁটির মত কিছুটা নুয়ে পড়েছে। মাথায় সাদা চুল, একমুখ দাড়িগোঁফ তাও সাদা, তবে একেবারে ধবধবে নয়, কিছুটা কটা লালচে বলা চলে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হলেও

তীক্ষ্ণ সতেজ প্রখর। সর্দার আলমা গুহার বাইরে এসে চারদিকে তাকালো। শুধু জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু নজরে পড়লো না। দূর থেকে ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে আসছে।

সর্দার আলমা মাটিতে কান লাগিয়ে উবু হয়ে শোনে, তারপর বলে—ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি...

সঙ্গীরা উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বলে উঠে—এই গভীর রাতে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ...

হাঁ, তবে একটা শব্দ খুব কাছে মনে হচ্ছে এবং অন্যগুলো বেশ দূরে...

এখন কি করা যায় বলো সর্দার? বললো আলমার সঙ্গী-সাথীরা।

আলমা নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলো—তোরা সব যার যে গুহায় চলে যা...

বললো সবাই —আর তুমি...

আলমা বললো—আমি এখানে এই পথের ধারেই থাকবো...

বললো সবাই—তা হয় না...

হাসলো আলমা—কেন হবে না? তোরা সবাই নিশ্চিন্ত মনে চলে যা। আমি একা থাকবো। মরতে হয় একা মরবো, তোরা চলে যা...

আলমার কথায় তার সঙ্গী-সাথীরা না গিয়ে আত্মগোপন করে রইলো।

শুধু আলমা দাঁড়িয়ে রইলো পেঙ্গুইন গাছের তলায়, পাথুরে মাটির বুকে সরু পথটার ধারে। যদিও অন্ধকারে কিছু নজরে পড়ছিলো না তবু বুড়ো আলমা তাকিয়ে রইলো সম্মুখের দিকে।

হঠাৎ কানে এলো আলমার কে যেন তাকে বললো—সর্দার, গুহার ভিতরে যা, নইলে অসংখ্য ঘোড়ার খুরের তলায় পিষে থেতলে যাবে তোর দেহটা।

বুড়ো চমকে না উঠলেও আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলেছে—কে, মাঠাগা?

হাঁ চাচা।

তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্?

তোমাকে একা ফেলে যেতে পারি না।

অন্ধকারে আলমার মুখ দেখা না গেলেও শুধু শোনা যায় তার কণ্ঠ—আমাকে একা ফেলে যাবি না তবে মরবি?

বললো মাঠাগা—তুমি যদি মরো তবে আমিও মরবো। যাবো না...

সত্যি যাবি না?

তোমাকে একা রেখে কোন্ প্রাণে যাবো?

তবে দাঁড়িয়ে থাক দেখবি কেমন করে একরাশ ঘোড়া আমার কুঁকড়ে যাওয়া দেহটাকে পিষে ফেলে।

সর্দার তুমি মরবে?

যদি মরণ আসে তবে মরবো। ওরে মাঠাগা, তুই বড্ড বোকা। আমি বুড়ো হয়েছি না হয় মরলাম। কিন্তু তুই...যা শিগগির পালা। যা বলছি, চট করে যা লক্ষ্মী মাঠাগা...

এবার না গিয়ে পারে না মাঠাগা, কারণ আলমার কথাগুলো বড় কোমল নরম ছিলো।

মাঠাগা চলে যায়।

কুকড়ে যাওয়া দেহটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আলমা। ততক্ষণে সম্মুখস্থ অশ্বপদশব্দ অতি নিকটে এগিয়ে এসেছে।

আরও কিছুক্ষণ কেটে যায়।

জমকালো অশ্বারোহী এগিয়ে আসে।

অন্ধকারে আলমা একটি শব্দ করে।

সঙ্গে সঙ্গে জমকালো মূর্তি তার অশ্বের লাগাম টেনে ধরে।

অশ্ব থেমে যায়।

আলমা অন্ধকারে ইংগিত করে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

জমকালো মূর্তি দস্যুরাণীকে শক্ত করে ধরে মাথাটা একটু নত করে অভিবাদন জানায় সে আলমাকে। তখন ভোরের ক্ষীণ আভায় পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

আলমা যেদিকে ইংগিত করে দেখিয়ে দিলো সেইদিকে অশ্ব চালনা করলো এবার জমকালো মূর্তি।

তীরবেগে ছুটলো সে।

পিছনে তখন অসংখ্য অশ্বপদ শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। মাত্র কয়েক দন্ড, তার মধ্যেই এসে পড়লো এক ঝাঁক অশ্ব, তীরবেগে আল্‌মার সম্মুখ দিয়ে চলো গেলো।

আলমা হাসলো একটু।

সম্মুখস্থ অশ্বটি তখন বহুদূরে চলে গেছে। পিছনের অশ্বঝাঁক অনুসরণ করে তীরবেগে এগুচ্ছে। পূর্বাকাশ বেশ পরিস্কার হয়ে এসেছে, সবকিছু ভালভাবে নজরে পড়ছে।

জমকালো মূর্তি দূরে এগিয়ে যেতেই তার দৃষ্টিগোচর হলো সম্মুখে বিরাট একটি খাদ। প্রায় বিশ-পঁচিশ হাত প্রশস্ত ফাটলের তলদেশে কঠিন পাথুরিয়া মাটি। জমকালো মূর্তি মুহূর্তের জন্য একবার অশ্ব বল্‌গা টেনে ধরলো, অশ্বসহ পিছিয়ে এলো কিছুটা। কিন্তু পরক্ষণেই ভীষণ বেগে এগিয়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়লো ফাটলের ওপাশে।

ততক্ষণে পিছনের অশ্বঝাঁকও ঐ ফাটলের সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এতবড় খাদ জমকালো মূর্তি অতি সহজে পার হয়ে গেলো দেখে অশ্বারোহীরা বিস্মিত হতবাক হয়ে গেলো। তারা নিজ নিজ অশ্বসহ ফাটলের ধারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ওদিকে দস্যুরাণীসহ জমকালো মূর্তি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো দস্যুরাণীর অনুচরগণ। তারা সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিলো। সবার অগ্রভাবে রয়েছে রহমত।

রহমতের দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। এমনভাবে কোনোদিন পরাজয় বরণ করেনি তারা। রাণীকে এভাবে হরণ করবে, কেউ ভাবতেও পারেনি। অধর দংশন করতে লাগলো রহমত।

একজন বললো—এখন উপায় রহমত?

রহমত বললো—সম্পূর্ণ উপায়হীন হয়ে পড়েছি আমরা। কে এই জমকালো মূর্তি যে রাণীকে চুরি করে নিয়ে উধাও হলো।

কিন্তু এত ভাববার সময় কই, যেমন করে হোক রাণীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে।

সবাই ফিরে চললো।

আলমা তখনও দাঁড়িয়েছিলো।

অশ্বঝাঁক ফিরে যাচ্ছে দেখে হাসলো আলমা। রহমত তার দল নিয়ে দ্রুত ফিরে চলেছিলো তাই তারা আলমার হাসি দেখতে পেলো না। যদি ঐ মুহূর্তে তারা আলমাকে হাসতে দেখতো তবে কোনোক্রমে রেহাই পেতো না সে। রহমত তাকে হত্যা করতো নৃশংসভাবে।

রহমত দলবলসহ ফিরে এলো আস্তানায়।

সেই দরবারকক্ষ।

কিছুক্ষণ পূর্বে যেখানে চলেছিলো নাচ-গান হাসি-আনন্দ আর, এই মুহূর্তে সেখানে নেমে এসেছে বিষাদের ঘনছায়া। সবার মুখেই নিরানন্দের ছাপ বিদ্যমান। যে যার আসনের সম্মুখে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো।

রহমত কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বললো—রাণীকে উদ্ধার করতে হলে আমার অনেককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। বলো কে কে তোমরা যাবে আমার সঙ্গে?

সবাই বললো—আমরা রাণীজীর উদ্ধারের জন্য সবাই হাসিমুখে প্রাণ দিতে রাজি আছি।

বেশ, তাহলে প্রস্তুত হয়ে নাও।

আমরা প্রস্তুত আছি। একসঙ্গে বললো সকলে।

রহমত বললো—আমি খুশি হলাম। হাঁ, আমরা ঐ খাদ পেরিয়ে ওপারে যাবো এবং রাণীজীকে উদ্ধার করে আনবো। কোনো শক্তিই আমাদের পথরোধ করতে পারবে না।

ঐ সময় একজন বৃদ্ধ অনুচর এগিয়ে এলো, নাম তার হিগাকো ঈশা। বহুকাল থেকে সে দস্যুতা করে এসেছে। যদিও তার পেশা ছিলো পরের সম্পদ লুটে নেওয়া কিন্তু মন ছিলো বড় উদার। তারই কোনো এক সঙ্গীর মুখে দস্যুরাণীর নাম শুনে মুগ্ধ হয়েছিলো সে। অনেক কষ্টে একদিন দেখা করবার সুযোগ পেয়েছিলো হিগাকো ঈশা দস্যুরাণীর সঙ্গে। মনের বাসনা সে জানিয়েছিলো অকপটে—আমি তোমার দলে আসতে চাই। রাণী প্রথমে রাগ করেছিলো কিন্তু পরে তাকে নিজের দলে গ্রহণ করেছিলো এবং সেই থেকেই হিগাকো রয়ে গেছে দস্যুরাণীর একজন অনুচর হিসেবে।

হিগাকো মন্থনা দ্বীপের আস্তানার একজন অনুচর। তার কাজ ছিলো, সবাই যখন দস্যুতা করে ফিরে আসে তখন তাদের পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করে রাখা এবং পুনরায় যখন দস্যুতার গমন করে তখন তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ যুগিয়ে দেওয়া।

দরবারকক্ষে যখন আনন্দোৎসব চলছিলো তখন হিগাকো তার সমস্ত পোশাক পরিচ্ছদ হিসেব করে গুছিয়ে রাখছিলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা বিপদসঙ্কেত ধ্বনি ভেসে আসে তার কানে। বুঝতে পারে হিগাকো, নিশ্চয়ই আস্তানায় কোনো অঘটন ঘটেছে। বৃদ্ধ হাতের কাজ ফেলে ছুটে যায় দরবারকক্ষের দিকে।

দরবারকক্ষের নিকটে পৌঁছতেই চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখতে পায় আর শুনতে পায়ে শুধু ধস্তাধস্তির শব্দ।

হিগাকো শিউরে না উঠলেও বুঝতে পেরেছিলো এমন কোনো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার কিছু ঘটেছে, নিকষ অন্ধকারে সে দেখতে পাচ্ছে না।

চারদিকে শুধু অন্ধকার।

দিশেহারার মত ঘুরতে থাকে হিগাকো।

ঠিক ঐ সময় তার সম্মুখ দিয়ে কে যেন চলে গেলো দ্রুতবেগে। হিগাকো সেই মুহূর্তে কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পেরেছিলো কেউ এসেছিলো দরবারকক্ষে, যে কাজ শেষ করে চলে গেলো।

হিগাকো বাধা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। কারণ অন্ধকারে সে এক পাও এগুতে পারে নি। বিরাট একটা ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছিলো সে নিজকে। কিছু পরে দরবারকক্ষে আলো জ্বললে দেখা গেলো রাণী নেই।

মাথায় তখন বাজ পড়েছিলো সবার।

রহমত মুহূর্ত বিলম্ব না করে অনুচরদের আদেশ দিয়েছিলো তাকে অনুসরণ করতে। ঐ দন্ডে একশ ঘোড়াও তৈরি ছিলো, অনুচর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো ভূগর্ভ আস্তানার সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে।

জমকালো মূর্তি যে পথে দস্যুরাণী সহ বেরিয়ে গিয়েছিলো, অশ্ব নিয়ে সে পথে চলা দুষ্কর ছিলো, তাই রহমত দলবল নিয়ে যে বিরাট সুড়ঙ্গপথটি

বেরিয়ে এসেছিলো ভূগর্ভ থেকে পৃথিবীর বুকে, ঐ পথ ধরেই এসেছিলো সে দলবল নিয়ে এবং অতি দ্রুতবেগে ধাওয়া করেছিলো জমকালো মূর্তির।

কিন্তু বিফল হয়েছে তারা।

রহমত ভীষণভাবে মুষড়ে পড়লেও সে এক দন্ডের জন্য হতাশ হয়নি। নিজেকে কঠিন রেখে সে রাণীর উদ্ধারের জন্য আগ্রাহ প্রকাশ করে চলেছে। রহমতের কথায় সরে এলো হিগাকো, বললো—ছোট সর্দার, একটা কথা বলবো?

হিগাকো রহমতকে ছোট সর্দার বলে ডাকতো। কারণ, রাণীজীর অবর্তমানে রহমতই আস্তানা পরিচালনা করতো। শুধু মন্থনা দ্বীপ আস্তানাই নয়, দস্যুরাণীর বিভিন্ন আস্তানার সহকারি অধিনায়ক ছিলো সে। তাই সবাই রহমতকে সমীহ করতো।

হিগাকোর কথায় বললো রহমত—বলো কি কথা।

হিগাকো বললো—রাণীজীকে কেউ কোনোদিন আটকে রাখতে পারবে না ছোট সর্দার, কাজেই তোমরা অহেতুক প্রাণ বিনষ্ট করো না।

চোখ দুটো জ্বলে উঠে রহমতের, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—নরাধম, বুঝতে পেরেছি রাণীর অমঙ্গলই তোমার কামনা। এই দন্ডে একে একে বন্দী করে রাখো, রাণীজীকে মুক্ত করে এনে এর বিচার হবে।

সঙ্গে সঙ্গে হিগাকোকে বন্দী করে ফেললো তারা। তাকে অন্ধকারাগারে আটক করে রাখা হলো।

রহমত আদেশ দিলো—তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হয়ে নাও, আর এক মুহূর্ত আমাদের বিলম্ব করা উচিত নয়। এ পৃথিবী আমরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজবো কোথায় সেই জমকালো মূর্তি আমাদের রাণীকে নিয়ে রেখেছে.....

রহমতের কথায় সবাই সমস্বরে সম্মতি দান করলো এবং যে যার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলো।

হিগাকোকে অন্ধ কারাকক্ষ থেকে চিৎকার করে বললো—তোমরা ভুল পথে যেওনা। রাণীজীকে তোরা কোথাও খুঁজে পাবে না। যেও না...যেও না...যেও না.....

কিন্তু হিগাকোর কথা কেউ কানে নিলো না। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

❑

আমলা চিৎকার করে ডাকলো—মাঠাগা, মাঠাগা এসো দেখবে, এসো তাড়াতাড়ি।

আলমার চিৎকারে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো মাঠাগা, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন এসে দাঁড়ালো আলমার চারপাশ ঘিরে।

সবার চোখেমুখেই উত্তেজনার ছাপ।

বললো আলমা—তোরা শুনতে পাচ্ছিস্ কিছু?

বললো মাঠাগা—হাঁ, আবার সেই অশ্বপদশব্দ শুনতে পাচ্ছি।

এবার তোরা খাদটার পাশে গিয়ে লুকিয়ে পড়, দেখবি পতঙ্গ যেভাবে আগুনে লাফিয়ে পড়ে তেমনি নির্বোধ অশ্বারোহীরা ওই খাদের মৃত্যুগহ্বরে কেমন করে আত্মাহুতি দেয়।

আলমার কথায় তার দলবল সবাই সরে গেলো, একরকম প্রায় ছুটেই গিয়ে লুকিয়ে পড়লো সেই মৃত্যুগহ্বর খাদটার আশেপাশে ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে।

ততক্ষণে নিকটবর্তী হয়েছে অশ্বারোহীরা।

একসঙ্গে প্রায় একশ অশ্বারোহী তীরবেগে চলে গেলো আলমার সম্মুখ দিয়ে।

আলমা হাসলো, মনে মনে বললো—ওরা নির্বোধ।

খাদের পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো অশ্বারোহীরা। সবার মুখই কালো হয়ে উঠেছে। সম্মুখে মৃত্যুগহ্বর। ওপাশে তাদের প্রিয় রাণীজী শত্রুহস্তে বন্দিনী।

রহমত চিৎকার করে বলে—থামলে কেন? যাও খাদ পার হয়ে যাও...

রহমতের নির্দেশ পাওয়ামাত্র শ্যাম নামক এক বলিষ্ঠ অনুচর তার অশ্ব নিয়ে প্রচণ্ডবেগে লাফ দিলো খাদের ওপাশ লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র এক আর্তনাদ ভেসে এলো। সে এক বীভৎস দৃশ্য! শ্যাম এবং তার অশ্ব খাদের তলদেশে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো অশ্ব সহ শ্যামের দেহটা।

রহমত একটুও ঘাবড়ালো না, পুনরায় সে নির্দেশ দিলো অপর জনকে খাদ পার হবার জন্য।

একটু বিলম্ব করলো না, রহমানের নির্দেশ পাবার পর পরই অশ্ব বিনয়ে বীরবিক্রমে লাফ দিলো দস্যুরাণীর বিশ্বস্ত অনুচর ইউছুফ।

ঠিক শ্যামের মতই সেও অশ্বসহ খাদের গভীর গহ্বরে কঠিন পাথরে পড়ে চুরমার হয়ে গেলো।

শিউরে উঠলো অশ্বারোহীরা।

রহমতের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। সে পুনরায় অপর একজনকে আদেশ করলো।

তৎক্ষণাৎ অপরজন অশ্ব নিয়ে এগিয়ে এলো এবং প্রচন্ড শক্তি নিয়ে লাফ দিলো খাদের অপর পার লক্ষ্য করে। কিন্তু সেও পারলো না, খাদের কঠিন পাথরে আছাড় খেয়ে পড়লো।

প্রায় বিশজন প্রাণ হারালো কিন্তু কেউ খাদের ওপারে পৌঁছাতে সক্ষম হলো না।

এবার রহমতের মন হতাশা এবং ব্যর্থতায় ভরে উঠলো। এখন উপায় কি করা যায়, কি করে ওপারে যাবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়লো।

আলমার অট্টহাসি ভেসে এলো রহমতের কানে। তার দলবল আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো, তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলো।

আলমার অট্টহাসির শব্দ রহমতের কানে যেতেই রহমত অশ্বমুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সঙ্গীদের লক্ষ করে বললো—দেখো কে এখানে আমাদের আশেপাশে আত্মগোপন করে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

রহমতের কথায় ছুটে যায় তার সঙ্গীসাথীরা। অন্বেষণ চালিয়ে বুড়ো আলমাকে ধরে আনে।

রহমতের চিনতে বাকি থাকে না এই বুড়োই তখন দাঁড়িয়েছিলো পথের পাশে। এতবড় স্পর্ধা ওর, সে আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বিদ্রুপপূর্ণ হাসি হাসছে।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে রহমত এবং ঐ মুহূর্তে অস্ত্র বের করে বসিয়ে দেয় আলমার বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে আলমার সঙ্গীরা বেরিয়ে আসে আড়াল থেকে। তাদের হাতেও মারাত্মক অস্ত্র ছিলো, সবাই ভীষণভাবে আক্রমণ করতে যায় রহমতের দলকে।

আলমা হাত তুলে তাদের ক্ষান্ত হতে বলে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে আলমার বুক, তবু সে দক্ষিণ হস্তে বুকের ক্ষত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে টলতে থাকে।

আলমার অদ্ভুত ব্যবহার দেখে বিস্মিত হয় রহমত। সে তাকে হত্যা করলো অথচ তার দলবলকে প্রতিশোধ নিতে দিচ্ছে না লোকটা—আশ্চর্য বটে, দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে রহমত বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধ আলমা ঢলে পড়ে ভূতলে, অতিকষ্টে বলে সে—তোমরা অহেতুক প্রাণ বিনষ্ট করছো...যার উদ্ধারের...আশায় তোমরা...চেষ্টা চালাচ্ছো...তাকে...তোমরা উদ্ধার...করতে পারবে না...সে যখন... ফিরে আসবে...তখন সে আপনা আপনি...আসবে...

আলমার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ঢলে পড়ে ওর মাথাটা একপাশে!

রহমত অশ্বত্যাগ করে বৃদ্ধের মাথাটা তুলে নেয় কোলে। অনুশোচনায় ভরে উঠে তার হৃদয়। বৃদ্ধের কথাগুলো তার মনকে ব্যথাকাতর করে তোলে। মনে পড়ে তাদের অনুচর হিগাকোর কথাগুলো, "রাণীজীকে কেউ কোনোদিন আটকে রাখতে পারে না ছোট সর্দার। কাজেই তোমরা অহেতুক প্রাণ বিনষ্ট করো না"...বারবার ঐ কথগুলো প্রতিধ্বনি হতে লাগলো রহমতের কানে। তারই নির্দেশে তাকে অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

রহমত আর বিলম্ব না করে দলবল সহ ফিরে চললো। বৃদ্ধ আলমার মৃতদেহ পড়ে রইলো পিছনে। তার মৃতদেহের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো তার দলবল। সবার চোখেই প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে কিন্তু সর্দারের নিষেধ আছে, আলমা বারণ করেছে ওদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে তাই তারা নীরবে হজম করে গেলো শত্রুর নির্মম আচরণ।

রহমত আস্তানায় ফিরে এসে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো এখন কিভাবে রাণীজীর উদ্ধারে তারা অগ্রসর হবে। হঠাৎ মনে পড়লো মিঃ আহাদ

চৌধুরীর কথা, এই বিপদ মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

মনস্থির করে নিলো রহমত। মিঃ আহাদ চৌধুরী এখন ঝাঁম শহরে আছেন জানতে পেরেছিলো সে কোনোক্রমে। কাজেই কতকটা আশ্বস্ত হলো রহমত এবং ঝাম শহর অভিমুখে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হলো।

ফিরে এসেই মুক্তি দিয়েছিলো রহমত হিগাকো ঈশাকে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলো সে। দস্যুরাণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা তাদের ব্যর্থ হবে, এ কথাই বলেছিলো বৃদ্ধ হিগাকো, সত্যই হলো তাই।

তাই মৃত্যুগহ্বরে প্রাণ দিতে হলো তারই কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে।

রহমত ঝাম শহর অভিমুখে রওয়ানা দেবার পূর্বে হিগাকো ঈশাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো—বলো এবার আমার যাত্রা শুভ না অশুভ হবে?

হিগাকো ঈশা হেসে বললো—যাত্রা শুভ বলেই মনে হচ্ছে রহমত কিন্তু কিছু বিপর্যয়ের আভাসও আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিপর্যয়!

হাঁ, রাণীজীকে উদ্ধার করতে গিয়ে কিছু বিপর্যয় আসবে কিন্তু সে বিপর্যয়কে পরিহার করে এগুতে হবে। তবে রাণীজীকে কেউ আটকে রাখতে সক্ষম হবে না। ফিরে সে আসবেই.....

এ কথা তুমি আরও বলেছো হিগাকো। যতদিন না রাণীজী ফিরে এসেছে ততদিন আমাদের স্বস্তি নেই।

রহমত ঐ দিনই রওনা দিলো ঝাম অভিমুখে। মন্থনা দ্বীপ থেকে ঝাম শহর হাজার হাজার মাইল দূরে। ঝাম শহরে যেতে হলে নীল নদ অতিক্রম করে যেতে হয়। প্রথমে অশ্বপৃষ্ঠে পরে জাহাজে এবং তার পরে উটের পিঠে, তারপর পদব্রজে।

রহমতের অশ্ব বেগে ছুটতে শুরু করলো।

আকাশে তখন খণ্ডখণ্ড মেঘের আনাগোনা চলেছে। সন্ধ্যা হতে আর বেশি বিলম্ব নেই।

❑

মিঃ আহাদ চৌধুরী ঝাম শহরের সবচেয়ে বড় বাংলো শিংশোশায় একটি বড় কক্ষে সোফায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেট পান করে চলেছে। কক্ষের চারপাশে বিরাট আকারের চারটি জানালা।

মিঃ আহাদ সম্মুখস্থ জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরের কুয়াশাচ্ছন্ন ঝাম শহরের দিকে। সকাল থেকে বড় কুয়াশা পড়ছে আজ। বাইরে বের হবার ইচ্ছা থাকলেও কেউ সহজে ঘরের বাইরে যাচ্ছে না। অতি প্রয়োজন বলেই কিছু কিছু লোক পথে নেমেছে। দু'চারটা উটের গাড়ি চলে যাচ্ছে পথ বেয়ে। ঝাম শহরে বড় একটা কুয়াশা নামে না সহজে, তবে এবার যেন কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। ক'দিন হলো সময়ে অসময়ে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা ঝাম শহরটা।

ঘন কুয়াশার স্তর ভেদ করে নজরে পড়ছিলো ঝাম শহরের পিছনে ইরিকা পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গমালা। মেঘের স্তরের মতই লাগছিলো, স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো না কিছু।

মিঃ আহাদ আপন মনে সিগারেট থেকে ধুম্ররাশি নির্গত করে চলেছেন। তার চারপাশ ঘিরে ধুম্রকুণ্ডলি ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিলো।

মিঃ আহাদ ভাবছিলো তার কাজের কথা। ঝাম শহরে তিনি এসেছেন কোনো এক রহস্যজাল উদঘাটন উদ্দেশ্যে। প্রথমে তিনি সিন্ধিরাজ্যে গিয়েছিলেন এবং সিন্ধিরাজ্যে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করার পর এসেছেন ঝাম শহরে।

আজ ঝাম শহরে মিঃ আহাদের চতুর্থ দিন। এসেই তিনি কাজে নেমে পড়েছেন। এ তাঁর অভ্যাস, নিরিবিলি সময় কাটানো মোটেই ভালো লাগে না। অদ্ভুত অভ্যাস বলা যায়—কেউ বলে কাজের লোক, কেউ বলে প্রখ্যাত গোয়েন্দারা চুপচাপ থাকতে পারে না।

কথাটা মিথ্যা নয়, কাজ না থাকলে মিঃ আহাদ চৌধুরী যেন স্বস্তিই পান না এক মুহূর্তের জন্যও। হাঁপিয়ে পড়েন একেবারে। সঙ্গী সাথী কেউ থাকলে তাস কিংবা পাশা নিয়ে বসেন। এসবে ঝোঁক তেমন না থাকলেও মনকে মানিয়ে নেন। অবশ্য যে কোনো খেলায় তাঁর পাকা হাত আছে এ কথা সত্য।

ছোটবেলা থেকে শরীরচর্চা, খেলাধুলো তাঁর অভ্যাস। ফুটবল খেলা থেকে হা-ডু-ডু খেলাও তিনি জানেন এবং কাঁচা নন পাকা বলা যায়। তবে এখন পাকা গোয়েন্দা বনে যাওয়ায় ওসবের কথা ভুলে গেছেন। মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা। বড় ভাল লাগে ওসব কথা ভাবতে। ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় তাঁর ঐ দিন গুলোতে...

আজও কুয়াশাঝরা সকাল বেলায় একা একা ঘরে বসে বড্ড নিঃসঙ্গ লাগছিলো—যদিও সিগারেট ছিলো তার পরম বন্ধুর মত একজন সাথী, তবু বড় একা মনে হচ্ছিলো আজ। রাশিকৃত ধুম্রজালে আচ্ছাদিত হয়ে ভাবছিলেন কুয়াশাগুলো বড় বেয়াড়া, নইলে এতক্ষণ তিনি বেরিয়ে পড়তেন...

এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। মিঃ আহাদের মুখখানা যেন দীপ্ত হয়ে উঠে—ভাবেন তিনি যাক তবু কেউ এলো কিছুটা সময় উৎরে নেওয়া যাবে। হয়তো ততক্ষণে বাইরের ঘন কুয়াশা কিছুটা হালকা হয়ে আসবে। আংগুলের সিগারেটটা সম্মুখস্থটি রক্ষিত ছোট্ট এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। আলনা থেকে হাত বাড়িয়ে ওভারকোটটা পরে নিলেন গায়ে, কারণ বেশ শীত শীত লাগছিলো। যেই আসুক না কেন কিছু সময় কাটানো যাবে।

দরজা খুলে দিতেই এক হপ্‌কা কুয়াশার সঙ্গে একটি লোক ঘরে প্রবেশ করলো। মিঃ আহাদ লোকটাকে চিনেত না পারলেও ওকে ভেতরে আহ্বান জানিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন। দরজা বন্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন তিনি আগন্তুকের মুখের দিকে।

লোকটা বুঝতে পারলো তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন আহাদ চৌধুরী। আর বিস্মিত হবার কথাও বটে, কারণ লোকটা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

মিঃ আহাদ কিছু বলবার পূর্বেই বলল আগন্তুক—আমি মন্থনা থেকে আসছি।

মিঃ আহাদ তখনও নীরব রয়েছেন, হয়তো পরবর্তী কথাটা শোনার জন্য উদগ্রীব আছেন তিনি।

আগন্তুক একটু থেমে বললো—আপনি কি মিঃ আহাদ চৌধুরী?

এবার মিঃ আহাদ বললেন—হাঁ! কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারছি না?

আমি রহমত, মন্থনা দ্বীপের আস্তানা থেকে আসছি। বলে থামলো রহমত, ওর গা থেকে বিন্দু বিন্দু কুয়াশা জমা জল ঝরে পড়ছে। বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে।

ওর কথায় মিঃ আহাদের ভ্রুজোড়া ঈষৎ স্ফীত হলো। তিনি বললেন—মন্থনা দ্বীপ! রাণীর কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছো?

হাঁ, চলুন বসে বলছি।

এসো।

এগুলেন মিঃ আহাদ চৌধুরী।

ফিরে এলেন ওরা পূর্বের সেই জায়গায়।

মিঃ আহাদের মুখমণ্ডল দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, একটা বিপুল উন্মাদনা নিয়ে তাকান তিনি রহমতের মুখের দিকে। কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা দুর্ভাবনার ছাপও ফুটে উঠেছে, না জানি কি সংবাদ সে এনেছে মন্থনা থেকে। মিঃ আহাদ জানতেন রাণী এখন মন্থনায় আছে। কেমন আছে, কি করছে তিনি জানতেন না। তাই তাঁর মনে বিরাট একটা জানার বাসনা।

বললেন মিঃ আহাদ—বসো।

রহমত বেশ ক্লান্ত ছিলো তাই সে বসে পড়লো একটা সোফায়। কোনোরকম দ্বিধা না করেই বললো—মিঃ চৌধুরী, গত পরশু আমাদের আস্তানায় বিশেষ কোনো কারণবশতঃ আনন্দোৎসব চলছিলো। এমন সময় একটি জমকালো মূর্তির আবির্ভাব ঘটে সেখানে.....

থামলো রহমত।

মিঃ আহাদ উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বললেন—তারপর?

জমকালো মূর্তি এমনভাবে আবির্ভূত হয়েছিলো যেন সে ভুইফোঁড় হয়ে বেরিয়েছে বলে মনে হলো। তার দু'হাতে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো। ঐ মুহূর্তে

আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না, কাজেই কোনো অস্ত্র হাতে তুলে নেবার সুযোগ পেলোনা কেউ।

রাণী—রাণী তখন কোথায় ছিলো?

সেই দরবারকক্ষেই ছিলো সে। রাণীজীও কোনোরকমে অস্ত্রে হাত দিতে পারলো না। জমকালো মূর্তি রাণীজীর বুক লক্ষ্য করেই তার হস্তস্থিত অস্ত্র উদ্যত করেছিলো, তাই কেউ কিছু করতে পারলাম না। হঠাৎ ঐ সময় আস্তানার সব আলো নিভে গেলো। আশ্চর্য, জমকালো মূর্তি যেন যাদু জানতো।

রহমত বলে চলেছে, মিঃ আহাদ চৌধুরী দু'চোখে রাশিকৃত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছেন তার মুখে। কাহিনীর শেষটা তিনি জানার জন্য যেন উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।

রহমত বলে চলেছে—আলো নিভে যেতেই শুরু হলো ভীষণ ধ্বস্তাধস্তি। অন্ধকারে কেউ গুলি ছুড়তে বা কোনো রকম অস্ত্র ব্যবহার করতে পারছি না আমরা, কারণ শত্রুপক্ষ একজন আর সবাই আমরা...

বলো তারপর কি হলো? রাণী, রাণীর সংবাদ কি বলো?

বড় দুঃসংবাদ!

দুঃসংবাদ?

হাঁ, রাণী নেই.....

রাণী নেই?

না। সেই অন্ধকারে রাণীজীকে নিয়ে উধাও হয়েছে সেই জমকালো মূর্তি।

বলো কি রহমত! কথাটা বলে মিঃ আহাদ চৌধুরী ক্ষিপ্তের মত উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে রহমতও উঠে দাঁড়ায়।

মিঃ আহাদ ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে—জমকালো মূর্তি তোমাদের রাণীজীকে হরণ করে নিয়ে গেলো আর তোমরা চুপচাপ রইলে? কিছু করতে পারলে না তোমরা?

মাথা নিচু করে জবাব দিলো রহমত—আলো জ্বলার পর আমরা দেখলাম রাণীজী নেই, শুধু পড়ে আছে তার রিভলভারখানা। রাণীজী

অন্ধকারেই নিজের কোমরের বেল্‌ট থেকে রিভলভারখানা খুলে নিয়ে ছিলো কিন্তু ব্যবহার করবার সুযোগ পায়নি।

মিঃ আহাদের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো, ক্রুদ্ধভাবে অধর দংশন করে বললেন—তোমরাও সুযোগ পাওনি, রাণীও পায়নি...কে সে জমকালো ব্যক্তি যার কাছে তোমরা এতগুলো বীর পুরুষ পরাজয় বরণ করলে?

জানিনা মিঃ চৌধুরী কে সে। নত মস্তকেই জবাব দিলো রহমত।

মিঃ আহাদের ভ্রুকুঞ্চিত হলো, তিনি বললেন—দস্যু বনহুর তো কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেনি?

না, তাকে রাণীজী পাতাল গহ্বরের অন্ধ কারাকক্ষে বন্দী করে রেখেছে, কারো সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে।

মিঃ আহাদ চৌধুরীর চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন—তোমাদের রাণীজী চুরি হবার পর তোমরা কি পাতাল গহ্বরে গিয়ে সন্ধান নিয়েছিলে সে সেখানে আছে কিনা?

না, সন্ধান নেইনি। জানি তাকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখান থেকে সাধ্য নেই সে পালায়।

মিঃ আহাদ একটু শব্দ করলেন—হুঁ। এবার তিনি পায়চারী শুরু করলেন।

রহমত স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো মিঃ আহাদের দিকে। মিঃ আহাদের মুখমণ্ডল রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে। রাগেক্রোধে তিনি যেন ভিতরে ভিতরে গুমড়ে উঠছিলেন। না জানি কোন্ মুহূর্তে তিনি ফেটে পড়বেন কিন্তু মিঃ আহাদ ঠিক ফেটে পড়লেন না, শান্তকণ্ঠে বললেন—তোমরা ভুল করেছো, সেই জমকালো মূর্তি স্বয়ং দস্যু বনহুর.....

অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে রহমত—অসম্ভব মিঃ চৌধুরী, এটা কোনো দিন হতে পারে না। দস্যুরাণীর পাতাল গহ্বর থেকে পালানো কারো সাধ্য নেই।

মিঃ আহাদ হেসে উঠলেন, হাসি থামিয়ে বললেন—অসাধ্য কিছুই নয় রহমত, এ কথা তুমি নিজেই বুঝতে পারছো। কারণ রাণীকে কেউ কোনোদিন বন্দী করে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি নিজেও জানো। তবে যদি কেউ তাকে বন্দী করে নিয়ে যায় তাকে আমি অস্বাভাবিক মানুষ বলবো। আমার বিশ্বাস, দস্যু বনহুর রাণীর পাতালপুরীর অন্ধ গহ্বরে বন্দী নেই এবং

সে-ই দস্যুরাণীকে নিয়ে উধাও হয়েছে। রহমতের মুখখানা অমাবস্যার অন্ধকারের মত অন্ধকার হয়ে গেলো। দৃষ্টি তার চলে গেলো সম্মুখের জানালা দিয়ে কুয়াশা ঢাকা ঝাম শহরের দিকে। ঠিকইতো, তারা কেউ পাতালপুরীর অন্ধগহ্বরে সন্ধান নিয়ে দেখেনি সেখানে দস্যু বনহুর বন্দী অবস্থায় আছে কিনা।

রহমতের মুখোভাব লক্ষ্য করে মিঃ আহাদ বুঝতে পারলেন তাঁর অনুমান সত্য। স্বয়ং দস্যু বনহুরই রাণীকে নিয়ে পালিয়েছে অথচ রাণীর অনুচরবর্গ তা এখনও জানে না। না জানি রাণীকে সে কিভাবে রেখেছে, তার সঙ্গে কি ব্যবহার করছে।

মিঃ আহাদের মুখোভাব গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠলো। তিনি আসন গ্রহণ করে অধর দংশন করলেন।

রহমত দাঁড়িয়েই বললো—মিঃ চৌধুরী, আপনি যা বললেন সত্যও হতে পারে। তবে অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, যেভাবে পাতালপুরীর অন্ধকারাগারে দস্যু বনহুরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো, সাধ্য নেই সে পালাতে পারে কিন্তু.....

বলো, থামলে কেনো?

এখন ভেবে দেখছি অসম্ভব কিছু নয়।

হাঁ, দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আমারও একদিন নানারকম ধারণা ছিলো। তার সম্বন্ধে অনেক অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনেছিলাম। তাই ইচ্ছা করেই একবার তাকে গ্রেপ্তার করার বাসনা নিয়ে কান্দাই গিয়েছিলাম। থামলেন মিঃ আহাদ।

রহমত উদগ্রীবভাবে তাকিয়ে আছে মিঃ আহাদের মুখের দিকে। দস্যু বনহুরকে যদিও তারা বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে, তবু ওর সম্বন্ধে যেন অনেক জানার বাকি আছে তাদের।

বললেন মিঃ আহাদ চৌধুরী—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি, কারণ তাকে পেয়েও গ্রেপ্তার করতে পারিনি।

রহমত যেন ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতেই পাশের সোফায় বসে পড়লো, তার দু'চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে মিঃ আহাদের মুখে।

মিঃ আহাদের বলিষ্ঠ দীপ্ত সুন্দর মুখখানায় গভীর একটা ভাবের উন্মেষ ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন— দস্যু বনহুরের কাছে আমি পরাজিত হয়েছিলাম রহমত।

মিঃ চৌধুরী, আপনি বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ্ অথচ কিনা বলছেন.....

হাঁ, যা সত্য তাই বলছি। আর সত্যই যদি না হবে তবে কেন তাকে পাশে পেয়েও গ্রেপ্তার করতে পারিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিলো সে মহৎ উদার, দস্যু হলেও তার হৃদয় আছে। আজ বুঝতে পারছি সে সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি জানতাম, দস্যু বনহুর নারীর প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করে না। আজ আমার সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলো! রহমত, আমিও কম নই.....দস্যু বনহুর রাণীকে হরণ করে মোটেই ভাল করেনি.....দাঁতে দাঁত পিষলেন মিঃ আহাদ, চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে।

❑

কে তুমি। বলো কে তুমি? আর কেনই বা আমাকে এখানে নিয়ে এলে? দস্যুরাণী কালনাগিনীর মত দাঁতে দাঁত পিষে কথাগুলো বললো।

তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জমকালো মূর্তি।

কুহেলি পর্বতের পাদদেশে অশ্ব রেখে পর্বতের মাঝামাঝি শৃঙ্গে জীবন্ত একটি লোককে বয়ে নিয়ে আসা কম কথা নয়। তবু যাকে বয়ে আনা হচ্ছে তার স্বইচ্ছায় তো নয়ই। জোরপূর্বক নিয়ে আসা হয়েছে, কাজেই বাহক যে রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এখনও জমকালো মূর্তির মুখের নিচের অংশ তার পাগড়ীর আঁচলে ঢাকা রয়েছে, শুধুমাত্র চোখ দুটো নজরে পড়ছিলো। গভীর নীল দীপ্ত দুটি চোখ, একজোড়া ভ্রু। দস্যুরাণীর দেহেও জমকালো ড্রেস তবে তার মাথার ক্যাপটা কোথায় খসে পড়েছে জানে না ওরা।

জমকালো মূর্তি দস্যুরাণী পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে নিজের মুখের নিচের অংশ থেকে কালো কাপড়ের আঁচল খানা সরিয়ে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে দস্যুরাণী ক্রুদ্ধভাবে উচ্চকণ্ঠে বললো—তুমি! তুমি দস্যু বনহুর?

হাঁ রাণীজী।

দাঁত পিষে কঠিন কণ্ঠে বললো দস্যুরাণী—তুমি আমার পাতাল পুরীর অন্ধ কারাকক্ষ থেকে পালিয়ে এসেছো?

হাঁ রাণীজী।

তোমার স্পর্ধা কম নয়।

তা বটে।

দস্যু বনহুরের কথা শুনে রাগে জ্বলে উঠে দস্যুরাণী, বলে সে— তুমি কিভাবে পালাতে সক্ষম হলে জানতে চাই? এত সাহস তোমার.....

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দস্যু বনহুর।

দস্যুরাণীর দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে, সে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। রাগেক্ষোভে ভিতরটা যেন তার গুমড়ে উঠছিলো। সমস্ত শরীরে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অসহ্য লাগছিলো দস্যুরাণীর এত বড় অপমান। বন্দী তারই কারাকক্ষ থেকে পালিয়ে তাকে চুরি করে নিয়ে এলো, অথচ.....

কি ভাবছো রাণীজী? বুঝেছি যা ভাবছো তা বলবার নয়। রাণীজী, আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি যখন আমার কারাগারে বন্দী হবে তখন যেন ভুলে না যাও আমাকে অভিবাদন জানানোর কথা.....

অধর দংশন করে বললো দস্যুরাণী—চুপ করো, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না।

তবে এখানে কার কথা শুনবে রাণীজী? এখানে যে শুধু তুমি আর আমি। যে জায়গায় তুমি এখন দাঁড়িয়ে আছো সেটা লোকালয় নয় বা কোনো ভূগর্ভ গুহা নয়—এটা কুহেলি পর্বত। আর তুমি এখন দাঁড়িয়ে আছো কুহেলি পর্বতের মাঝামাঝি কোনো এক শৃঙ্গের গুপ্ত গুহায়।

## পরবর্তী বই

## কুহেলিকা